শ্রেষ্ঠ গল্প

নিকোলাই গোগল

আলোকিত মানুষ চাই

নিকোলাই গোগল
শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদনা
শহিদুল আলম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৪৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
আশ্বিন ১৪০২ অক্টোবর ১৯৯৫

চতুর্থ সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0143-4

www.pathagar.com

ভূমিকা

আঁদ্রে মোরোয়ার ভাষ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বাদ দিলে, সমালোচকেরা সাধারণত পুশকিন, গোগল, টলস্টয় এবং দস্তয়ভস্কি—সাহিত্যের এই চার মহারথীকে একই পর্যায়ে ফেলে থাকেন। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, রাশিয়ার জাতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি পুশকিন এবং গোগল থেকে। এঁরা ছাড়া আর কেউ এ-পর্যায়ে পড়েন না।

গোগল ছিলেন বিষণ্ন প্রকৃতির মানুষ। আপন মনোরাজ্যে যে নাটক সর্বক্ষণ অভিনীত হয় তা থেকে তিনি কোনোদিন মুক্তি পাননি। আপন প্রতিভার সঙ্গে আপনি যুদ্ধমান এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তিনি। দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের ফলে তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হয় মৃত্যু অবধি।

ইউক্রেনের লোকেরা উপকথা শুনতে খুব ভালোবাসে। উঁচু বুটজুতো, মোটা পাতলুন এবং মেষচর্মের টুপি পরিহিত যাযাবর কথকরা তাদের উপকথা শুনিয়ে বেড়ায়। গোগল এসব উপকথা প্রাণভরে শুনতেন। বীরত্বব্যঞ্জক গাথাও তিনি প্রচুর শিখেছিলেন। ইউক্রেন একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ। সেখানে প্রায়ই তাতার মুসলিম এবং পোলিশদের মধ্যে যুদ্ধ হত। কসাকদের মধ্যে জাপোরেদা নামে একটি সম্প্রদায় আছে। যুদ্ধপ্রিয় এই সম্প্রদায়ের সন্তান গোগল।

গোগল পরিবার সচ্ছল ভূম্যাধিকারী ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন নম্র-স্বভাবের ভদ্রলোক। তিনি ল্যাটিন জানতেন এবং মিলনাত্মক নাটক লিখতেন। মা ছিলেন সরলহৃদয় স্নেহ-পরায়ণ মহিলা। তাঁরা ছিলেন আদর্শ স্বামী-স্ত্রী। একে অপরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, এত অনুরক্ত যে অনেক সময় তা হাস্যকর ঠেকত। গোগল হয়তো তাদের দেখেই 'সাবেকি জমিদার পরিবার' লিখেছিলেন।

রাশিয়ায় তখনো দুষ্ট ভূমিদাস প্রথা বিদ্যমান ছিল। সে সময় চাষিরা ছিল দাস : মালিক যখন ইচ্ছা তাদের বেচাকেনা করতে পারতেন।

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহ বিশেষ পুষ্ট না-হলেও বুদ্ধি ছিল প্রখর। ভাঁড়ামি এবং অনুকরণের ক্ষমতা ছিল তাঁর অসীম এবং কণ্ঠস্বর ছিল তীক্ষ্ণ। বন্ধুদের আচার-ব্যবহার, এমনকি তাদের চিন্তারও তিনি প্রতিরূপ দিতে পারতেন। অল্প বয়সেই তিনি থিয়েটারের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং লিখতেও আরম্ভ করেন। কিন্তু বরাবরই তাঁর স্বপ্ন ছিল বিশাল একটা-কিছু করার। নিজের দেশের কাজে নিয়োজিত থেকে দেশকে মহৎ আদর্শ পথে পরিচালিত করার ইচ্ছা ছিল তাঁর।

১৮২৫ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তখন গোগলের বয়স ষোল। ধর্ম তাঁর কাছে ছিল একটা কথার কথা মাত্র, কিন্তু তিনি মৃত্যুকে ভীষণ ভয় করতেন। নরক সম্বন্ধে লিখিত ধর্মোপদেশাবলি তাঁর মনে ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করত। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন

www.pathagar.com

ততদিনই তাঁর মনে শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে বিশেষ ভীতি বিদ্যমান ছিল। যুবক হিসেবে তাঁর সবচাইতে বেশি ভয় ছিল, হয়তো তিনি দুনিয়ার বুকে কোনো চিহ্ন না-রেখেই মারা যাবেন। প্রায়ই তিনি ঘোষণা করতেন, "আমার লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে আমার অভীপ্সা সৌধের এমন সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলব যা কোনো আঘাতেই নড়বে না।" কিন্তু চরিত্রে আবেগপ্রবণতার প্রাধান্যের কারণে সেই মহাসৌধ কী তা যেমন তিনি জানতেন না, অন্যেরাও জানত না।

উনিশ বছর বয়সে খ্যাতির উচ্চাশায় তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গে গমন করেন। কিন্তু রাজধানী দেখে নিরাশ হলেন তিনি। দরিদ্র, একা এবং অপরিচিত। রাজধানীর কোনো এক বাড়ির চিলেকোঠায় শুয়ে শুয়ে তিনি ইউক্রেনের স্বচ্ছ আকাশের স্বপ্ন-দখতেন। সুদূর থেকে তাঁর মনে হত যে গ্রাম্য জীবন তিনি ছেড়ে আসার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন তা যেন একটা মহৎ পল্লী-কাব্য। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'কাব্যে পল্লীকাহিনী' হ্যানস কিচেলগার্টেন ছদ্মনামে লেখা। বইটি আদৌ সমাদৃত হয়নি। ক্ষোভে-দুঃখে গোগল ওটি পুড়িয়ে ফেলেন। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন গোগল। নারী তাঁকে শঙ্কিত ত্রস্ত করে তুলত। কল্পনায় দেখতেন বহু অপূর্বসুন্দরী নারী তাঁর প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে। পুত্রবৎসল মা'র কাছে তিনি লেখেন, এক সাংঘাতিক নারীর কবল থেকে বাঁচবার জন্য তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কিন্তু আসলে এমন কোনো নারীর অস্তিত্বই ছিল না। প্রকাশিত পুস্তকটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পরে তিনি রাজধানী ত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কৌশলে মায়ের কাছে থেকে টাকা যোগাড় করে তিনি জার্মানি চলে যান। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। এরপর রাজকীয় ভূমি বিভাগে একটি ছোট চাকরি পেয়ে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে আবার ফিরে আসেন। এখানে চাকরি করার সময় গোগল ক্ষুদে সরকারি কর্মচারিদের জীবনপ্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। তিনি নিজে ছিলেন দরিদ্র এবং দারিদ্র্যকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর একটি মাত্র গ্রীষ্মকালীন ওভারকোট ছিল, 'কোটটিতে হাওয়ার লাইনিং' দেওয়া ছিল। অর্থাৎ তার মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবেশ করত। সুতরাং উত্তরের শীতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। তিনি যে শুধু শারীরিক যন্ত্রণাই ভোগ করতেন এমন নয়, তাঁর আত্মসম্মানেও ঘা লেগেছিল নানাভাবে, কেননা তাঁর কোট গলাবন্ধ এবং জ্যাকেট ফ্যাশন-দুরস্ত ছিল না। বালজাক এবং স্তাঁদালেরও অনুরূপ দুর্বলতা ছিল। নিজের মধ্যে অনুভূতি তীব্র না-হলে তীব্র অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ সময়ে আলেকজান্দ্র অম্পিভনা রসেট নাম্নী একুশ বছর বয়স্কা এক অপরূপ সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই মহিলা ছিলেন রাজপরিবারের প্রিয়পাত্রী। পুশকিন এবং তাঁর বন্ধুমহলের সঙ্গে এই মহিলা গোগলকে পরিচয় করিয়ে দেন। গোগলকে তিনি 'খোগল' বলে ডাকতেন।

রাশিয়ার আকাশে পুশকিন তখন সাফল্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান এবং গোগল তখন স্রেফ উচ্চাভিলাষী এক পথিক মাত্র। রসেটের মন্তব্য : "পুশকিন কত ভালো। দেখা হওয়া মাত্র তিনি এই একগুঁয়ে বিমর্ষচিত্ত 'খোগল'কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন।"

গোগলের 'দিকানকা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা' (বর্তমান বইয়ের আরোচিনেৎসের মেলা) ও 'সেন্ট জন উৎসবের আগের দিনের সন্ধ্যা' (গল্প দুটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত) নামক ইউক্রেনীয় গল্পসম্ভার প্রকাশিত হওয়ার পর পুশকিন মন্তব্য করেন : "গল্পগুলো সত্যিকার সহজ আনন্দ দেয়। এ আনন্দ স্বতোৎসারিত। এর মধ্যে অন্যের প্রতি বিদ্রূপ নেই...এক

www.pathagar.com

আশ্চর্য সংবেদনশীলতা!" ঘৃণ্য নাগরিক কুশ্রিতা ছেড়ে গোগল তাঁর এই গল্পগুলোতে শৈশব-জীবন ফুটিয়ে তোলেন। সম্রাজ্ঞী থেকে আরম্ভ করে ছাপাখানার কম্পোজিটর পর্যন্ত সকল পাঠকই গল্পগুলো পড়ে মোহিত হন। সঙ্গে সঙ্গেই গোগল খ্যাতি লাভ করলেও গল্পগুলো নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি জানতেন ওগুলো আসলে শূন্যগর্ভ। গর্বিত গোগল উন্নততর সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দিলেন। মানবজীবনের সাধারণতা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই বৈচিত্র্যহীন জীবন থেকে মানুষকে মুক্তি দেবেন—এই ছিল তার ইচ্ছা।

একরকম মানসিক ব্যাধির শিকার হয়ে পড়েন তিনি। বিরাটত্বের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি অথচ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল গলাবন্ধের দিকে। সাধারণ চেহারা এবং সরু নাসিকা নিয়ে তিনি কামনা করতেন মহান প্রেম। সুতরাং তাঁর পরবর্তী দুটি গ্রন্থ 'মিরগোরদ'-এবং 'আরাবোস্কি' -এর সুর অপেক্ষাকৃত কঠিন হল। ছেলেবেলার পরীরাজ্যের পরিবর্তে তিনি বাস্তব দুনিয়ার দুঃখ-দুর্দশা চিত্রিত করলেন। 'ওভারকোট' তাঁর একটি অপূর্ব গল্প। তুর্গেনিভের মতে 'আমরা সকলেই এই ছাঁচে তৈরি।' আর "আমরা সবাই বেরিয়েছি গোগলের 'ওভারকোট' থেকেই"—এই মন্তব্যের দ্বারা দস্তয়েভস্কি নিজেকে গোগলের অনুগামী ও 'শিষ্য' বলে স্বীকার করে নেন। আকাকি আকাকিভিচ নামক এক ব্যক্তি সরকারি অফিসের গরিব কেরানি। তার স্বপ্ন, একদিন একটি নতুন ওভারকোট তৈরি করাবে। সারাজীবন ধরে সে এজন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করে : তার দুর্ভাগ্য, যেদিন কোটটি তৈরি হল সেইরাত্রেই সেটি চুরি হয়ে গেল।

গল্পটি যেমন সাধারণ, লেখকের কল্পনাও তেমনি আকাশচুম্বী। সেইসঙ্গে গোগল এতে বাস্তব জীবনের সমন্বয় ঘটাতেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

সফল শিল্পকর্মের মধ্যে এমন একটা কোমলতার ভাব থাকে যা মানুষকে সান্ত্বনা দেয়, আনন্দ দেয়। আবার শিল্প একই সঙ্গে মানুষের যাবতীয় সদ্‌গুণাবলি তুলে ধরে। কিন্তু গোগলের আধ্যাত্মিক অভিযানের দুঃখজনক দিক হল তাঁর মধ্যে শয়তান কেবল মানুষের দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো দেখতেই বিকৃত আনন্দবোধ করে। তিনি হোমার, পুশকিন, এককথায় মহৎ কাব্য পাঠ করতে ভালোবাসতেন। কিন্তু শয়তান তাঁকে কেবল তীক্ষ্ণ মজার গল্প লিখতে বাধ্য করে; যেমন *নাক*, যেমন *পাগলের দিনপঞ্জি*।

তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'পোর্ট্রেট' একটি বিশেষ স্টাইলে লেখা। গল্পটির বিষয়বস্তু একটি চিত্র। পরপর কয়েক ব্যক্তি এটি ক্রয় করেন। কিন্তু এটি প্রত্যেকের বাড়িতেই দুঃখ, দুর্যোগ, মৃত্যু এবং ধ্বংস নিয়ে আসে। চিত্রটি কেন অভিশাপ বয়ে বেড়ায়? কারণ চিত্রটি শয়তানের সহযোগিতায় আঁকা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে স্থূল বাস্তবের যোগ ছিল। এই গল্পটি গোগলের প্রথম বয়সের লেখা। তাঁর পরবর্তী জীবনের সমস্ত লেখাও এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। তিনি তাঁর কোনো রচনাই পছন্দ করতেন না। কেননা তার মধ্যে নাকি স্থূল বাস্তবতার ছোঁয়া থাকত। তাঁর মতে তিনি শয়তান কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিল্পে মহৎ ভাব প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতেন।

গল্পের বিষয়বস্তুর জন্য গোগল প্রায়ই পুশকিনের শরণাপন্ন হতেন। 'সরকারি ইনস্পেক্টর' গোগলের এমনই একটি নাটক যার প্লট পুশকিনের দেওয়া। কাহিনীটি এরকম : একটি ছোট শহরের প্রত্যেকটি সরকারি কর্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ। এক সময় তারা জানতে পারে যে তাদের কার্যকলাপ গোপনে তদন্ত করার জন্য শীঘ্রই ছদ্মবেশে এক

www.pathagar.com

ইন্সপেক্টর আসবেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে সরাইখানায় এক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন হয়। অপরাধী ব্যক্তিগণ ইন্সপেক্টরকে হাত করার সকল প্রকার প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। টাকা-পয়সা, মদ, স্ত্রীলোক কোনোটাই বাদ যায় না। আগন্তুক এরকম মহানুভবতায় চমৎকৃত হয় এবং এ তামাশায় যোগদান করে। সে ঘুষ গ্রহণ করতে থাকে এবং তার মনোরঞ্জনের জন্য প্রেরিত আমলাদের স্ত্রী এবং কন্যাদের সঙ্গে প্রেম করতেও পিছপা হয় না। কিন্তু সত্যিকার ইন্সপেক্টর আবির্ভূত হলে এ ব্যাপার আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে, কিন্তু ততদিনে জাল ইনস্পেক্টর সেখান থেকে সরে পড়েছে।

পুশকিন প্রদত্ত এই হাসির বিষয়টি অবলম্বন করে গোগল ক্ষুদে সরকারি কর্মচারীদের নীচতা, লোভ ও নীতিহীনতার ওপর এক মারাত্মক প্রহসন রচনা করেন। সম্রাট স্বয়ং এই প্রহসনটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করে খুব কৌতুক বোধ করেছিলেন। 'কোনো আমলাই এই প্রহসন থেকে বাদ পড়েনি—এমনকি আমিও নই।' জার নিকোলাস মন্তব্য করেন এবং নাটকটি অভিনীত হওয়ার আদেশ দেন। সেন্ট পিটার্সবার্গে 'সরকারি ইন্সপেক্টর'-এর অভিনয় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মচারীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গোগল এতে বিস্ময় বোধ করেন। তাঁর আশা ছিল তারা সংশোধিত হবে। তাছাড়া তিনি নিজেকেও কি উপহাসের বস্তু করেননি? 'সকলেই আমার বিরুদ্ধে, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, ব্যবসায়ী, লেখক—এককথায় প্রতিটি ব্যক্তি আমার নাটকটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে চায়। সত্যি সত্যি আমার ভয় হয়।'

রাশিয়ার বাইরে কোথাও তিনি চলে যেতে চাইলেন কিন্তু তার আগে আবার বিদেশে বাসকালে লেখার জন্য একটি 'বিষয়'-এর জন্য পুশকিনের দ্বারস্থ হলেন। পুশকিন তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে একটি অদ্ভুত এবং অপূর্ব সুন্দর বিষয় গোগলকে প্রদান করেন। স্পেনীয় সাহিত্যে ডন কুইকসোটের যে স্থান, গোগলের হাতে পড়ে এ কাহিনী রুশীয় সাহিত্যে সেই স্থান করে নিতে সমর্থ হয়। সে কালের রাশিয়ায় এক অদ্ভুত জালিয়াতি প্রচলিত ছিল। তাকে কেন্দ্র করেই এ কাহিনী। প্রত্যেক বছর পরপর প্রত্যেক রুশ জমিদারকে সরকারের নিকট একটি বিবরণী দাখিল করতে হত। এতে তার অধীনস্থ ভূমিদাসদের সংখ্যা থাকত। এ সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সরকার ট্যাক্স ধার্য করতেন। পরবর্তী বিবরণী দাখিলের সময় পূর্বের কোনো ভূমিদাসের মৃত্যু হলে সেজন্য ট্যাক্সের তারতম্য হত না। ভূমিদাসদের বন্ধক রেখে ঋণদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হত ভূমিদাসদের সংখ্যা গণনা করে। এখানেই ছিল জালিয়াতির সুবর্ণ এবং ব্যাপক সুযোগ। মৃত ভূমিদাস প্রায় বিনামূল্যেই বিক্রয় করতে কেউ দ্বিধা করবে না, কেননা সে জন্যে ট্যাক্স থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ক্রেতা ঐ ভুয়া ভূমিদাসদের জামানত রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিপুল টাকা ঋণ পেতে পারে। ধার নেওয়ার পর সরে পড়লেই হল। প্রতারণার এর চাইতে উত্তম সুযোগ আর কী হতে পারে?

বিষয়টি শুনে গোগল উল্লাস বোধ করেন। এর মধ্যে তিনি দুশ্চরিত্রদের কাহিনী-প্রধান একটি উপন্যাস লেখার সম্ভাবনা দেখতে পান। সেন্ট পিটার্সবুর্গ ত্যাগ করার আগেই কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচনা করে তিনি পুশকিনকে পড়ে শোনান। তিনি নিজে যেমন হাসতেন তেমনি হাসি পছন্দও করতেন। "কিন্তু যত পাঠ করতে লাগলাম ততই তিনি বিমর্ষ হতে লাগলেন। এবং আমি যখন শেষ করলাম তখন তিনি মন্তব্য করলেন—'হা ঈশ্বর! আমাদের রাশিয়া কী বিষাদময় স্থান!" এরপর তিনি বিষয়টি মাথায় নিয়ে

www.pathagar.com

সুইজারল্যান্ড, প্যারি ঘুরে বেড়ালেন। মন টিকল না কোথাও। রোমে গিয়ে স্বস্তি পেলেন। এই নতুন পরিবেশে তিনি Dead Souls 'মৃত আত্মা' লিখতে লাগলেন। এখানে অবস্থানের সময়েই তিনি এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পুশকিনের মৃত্যুর খবর শুনতে পান। খবরটি তাঁকে খুবই বিচলিত করে। কিন্তু ততোদিনে তাঁর কাছে পুশকিনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে কেননা একটি উত্তম শিল্পকর্ম রচনার উপযোগী মালমসলা এবং ভাবটি তিনি তাকে দিয়ে গিয়েছেন।

দু বছর ধরে রোমে বসে গোগলের এ কাহিনী-লেখা চলতে থাকে। মৃত ভূমিদাস ক্রেতা সিটসিকভ তার নিজেরই ব্যঙ্গরূপ হয়ে উঠল—বেশ ভাব-গম্ভীর, এবং আড়ম্বরপূর্ণ, নেতি-ধর্মী, স্বভাব-দুষ্ট নয়, কিন্তু সামাজিক অবস্থার টানাপোড়েনে সে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত সাধারণ একটি লোক, নিজের পরিকল্পনা সফল করার ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন। এ জন্য সে গাড়োয়ান সেলিফেইন, গাড়ি এবং তিনটি ঘোড়া নিয়ে সারা রাশিয়া চষে বেড়াচ্ছে। সে এক জমিদারের বাড়ি থেকে অন্য জমিদারের বাড়ি যাচ্ছে এবং 'মৃত ভূমিদাস' ক্রয় করে বেড়াচ্ছে। এসব করতে গিয়ে প্রতিদিন তাকে আশ্চর্য সব লোকের সঙ্গে মিশতে হচ্ছে—কৃপণ, যে তার 'মৃত ভূমিদাস' বিক্রয় ব্যাপারেও দরকষাকষি করছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মৃত আত্মা দু রুবল দরে বিক্রি করছে। আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলা, যিনি 'মৃত আত্মা' বিক্রয়ের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন এবং তাকে মধু এবং গম দিয়ে বিদায় করলেন—এই উভয় প্রকৃতির মানুষের সাথেই তাঁর মোলাকাত হচ্ছে।

গোগল এ গ্রন্থে মোটেই হাস্যরস পরিবেশন করেননি—এর মর্মমূলে রয়েছে গভীর বিষাদের বোঝা। নির্বোধ লোভী এবং ভণ্ড মানুষ যে সত্যি সত্যিই চরম অভিশপ্ত এবং তাদের মুক্তি যে সুদূরপরাহত সেটাই দেখান হয়েছে এই উপন্যাসে। সিটসিকভ এবং যারা সিটসিকভের কাছে 'মৃত-আত্মা' বিক্রি করে তারা কেউ সজ্ঞান অপরাধী নয়। হয়তো তাদের মধ্যে কোনো মানবিক অনুভূতি নেই। সিটসিকভ সম্পত্তির মালিক, গোগলের কথায় ক্রেতা। সে স্বপ্ন দেখছে আরাম-আয়েশের জীবনের। 'তার রাজ্য ক্রমাগত...এবং আপনাদের একথা অনুধাবন করা দরকার যে আর দশজনের মতোই সে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানী ব্যক্তি।' উদ্বেগ এখানেই। মানবসমাজ সিটসিকভদের অস্বীকার করতে পারে না। উপন্যাসটি অপূর্ব, ভয়াবহ এবং দুশ্চিন্তা উদ্রেককারী।

১৮৪১ সালে তিনি মস্কোতে ফিরে আসেন এবং 'মৃত-আত্মা' (Dead Souls) সেন্সর বিভাগে দাখিল করেন। সেন্সর বিভাগের কর্মকর্তা পাণ্ডুলিপি পাঠ করে হতবাক হয়ে পড়েন। "আত্মা অমর সুতরাং মৃত আত্মা বলে কিছু হতে পারে না। তাছাড়া মাত্র আড়াই ডলারে একটি 'আত্মা' বিক্রয়! এত কম দাম! মানুষের মর্যাদার প্রতি এর চাইতে চরম অবমাননা আর হতে পারে না।" মস্কোর সেন্সর এ বই ছাপার অনুমতি দিল না। অনুরাগী এক প্রিন্স স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছাড়পত্র এনে দিলেন। বইটি প্রকাশিত হল। আবার কপালে জুটল নিন্দা আর বিরূপ সমালোচনা। পাঠক এর মধ্যে নিজের অসারতার প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করে চমকে উঠল। একবার পুশকিন কথাচ্ছলে গোগলকে বলেছিলেন যে, জীবনকে তাঁর চাইতে বেশি বৈচিত্র্যহীন ও সাধারণ করে তুলে ধরার ক্ষমতা আর কারো নেই। কিন্তু যে কেবল রূঢ় বাস্তবকেই অঙ্কন করে যায় সেই চিত্রকরকে কে ভালোবাসে!

বৃথাই গোগল সমালোচকদের লক্ষ করে বলতে লাগলেন 'এ বইয়ে আমার নিজ আত্মার কথাই বলা হয়েছে। পাশবিকতার সকল দিকই আমার মধ্যে অল্প পরিমাণে

www.pathagar.com

বিদ্যমান।' কোনো এক বন্ধুকে তিনি লেখেন, 'আমার নিজের দোষত্রুটিগুলো তো আছেই তার ওপরে আবার বন্ধু-বান্ধবদের দোষগুলোও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে।' আসলে ব্যঙ্গরসের মধ্যে যখন তিক্ততা মিশিয়ে দেওয়া হয় মানুষ তখন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর গোগলের জগতে মৃত আত্মারাই শুধু বাস করে। তাঁর সৃষ্ট মানুষ মাত্রেই হয় অতি সাধারণ অপরাধী, কিংবা উন্মাদ কিংবা সর্বদা নিদ্রামগ্ন। 'ও সমস্ত মৃত আত্মা তুমি এবং আমি ছাড়া আর কেউ নয়।'—তিনি বলেন, তাঁর বিদ্রূপ তাঁর আপন সত্তাকে ছেড়ে যেমন কথা বলে না তেমনি পাঠকেরাও বাদ পড়েন না। কিন্তু এ শাস্তি গ্রহণ করা সহজ নয়। নিজের জীবনকালে গোগল তাঁর স্পষ্টভাষিতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগে ভুগেছেন। 'নিজের স্কন্ধে মড়া বয়ে চলনরত মড়াটিকে' তিনি লক্ষ করেছিলেন বলেই শিল্পকর্মের মধ্যে তিনি সেই বোঝাকে নামিয়ে মুক্তি পেয়েছিলেন। আর ঠিক সে-কারণেই তাঁকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছিল। জীবনের শেষ অধ্যায়ে গোগল নীতি এবং ধর্মের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছেন। "আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলো নষ্টামো আর পাপাচারে একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। ক্রমাগত এ দৃশ্য দেখতে দেখতে পাঠক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে : সে তখন চায় এমন একটি স্থান যেখানে থেমে সে বিশ্রাম নিতে পারবে।" তিনি ভাবলেন আলোর অভাবে উপন্যাসটি রীতিমতো অসহ্য হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আলো সরবরাহ করবেন।

কিন্তু জীবন্ত আত্মাদের ছবি আঁকতে হলে শিল্পীকেও তাদের একজন হতে হবে। গ্রন্থের মধ্যে আলো দিতে হলে নিজের অন্তরকে প্রথম আলোকিত করতে হবে। পুণ্যস্থান জেরুজালেমে গমনের ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে। বন্ধুরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। 'পত্রাবলির একটি সংকলন' প্রকাশ করে গোগল নতুন করে শুরু করতে মনস্থ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল এভাবেই তিনি মৃত-আত্মা লেখার অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। অর্থাৎ লোকেরা তাঁর অপরাধ মার্জনা করে দেবে। কিন্তু ফল হল ভয়াবহ। প্রগতিপন্থী নাস্তিকেরা তাঁকে তো আক্রমণ করলই সাধারণ পাঠকেরাও মন্তব্য করতে বাদ দিল না। তাঁর বিনয় দাম্ভিকের বিনয় বলে অভিযোগ উঠল। অথচ তিনি সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করতেন যে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো দিয়ে তিনি তাঁর নিজের এবং অপরের অন্তরে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে পারবেন : সমাজ ভালো হবে এবং তাঁর দেশ সচ্চরিত্র কর্মচারিদের দ্বারা শাসিত হয়ে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।

১৮৪৭ সালে গোগল জেরুজালেম রওয়ানা হলেন। সেখানে যিশুখ্রিস্টের সমাধির সামনে গিয়ে বসবেন এবং ঈশ্বর তাঁকে লেখক এবং মানুষ হিসেবে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন—এই ছিল আশা। কিন্তু এই যাত্রাও ব্যর্থ হল। কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর না-ছিল আস্থা, না-ছিল আশা। ক্রমশ বিমর্ষতা তাঁকে আঁকড়ে ধরল। বিয়াল্লিশ বছর বয়সেই তাঁকে বুড়ো দেখাত। মানসিক শান্তি না-থাকায় তিনি কোনো কাজও করতে পারছিলেন না।

অনেকে ভাবতেন তিনি রোগের ভান করছেন। কিন্তু আসলে তাঁর জীবনটা ছিল মৃত্যুপথযাত্রীর জীবন। তিনি তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে তরুণ তুর্গেনিভের সঙ্গে গোগলের পরিচয় হয়। তাঁর তীক্ষ্ণ ও পর্যবেক্ষণরত দৃষ্টির মধ্যে যে অন্তর্যাতনা ফুটে উঠত তা তুর্গেনিভ লক্ষ করেছিলেন। অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন না, বসে বসে হাই তুলতেন। অনেকেই বলত তাঁর পাগল হতে আর দেরি নেই। আবার কেউ কেউ বলতেন, ও কিছুই নয়, দৃশ্যত যা পাগলামি তা আসলে

www.pathagar.com

আপনাকে রহস্যময় করে তোলার স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টা। পাণ্ডুলিপির এক পাশে এ সময় তিনি কাটাছেঁড়া করে লেখেন '...দুনিয়া এক অবোধ্য যাতনায় ভুগছে।...সব কিছু যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে...সবই যেন একটা মহা কবর। হা ঈশ্বর! তোমার দুনিয়া কত শূন্য এবং ভয়াবহ।'

তিনি স্বীকারোক্তি করেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মনে হয়েছিল স্বপ্নে কে যেন বলছে তাঁর মৃত্যু খুব নিকটবর্তী। ধীরে ধীরে তাঁর মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 'মৃত-আত্মা'র দ্বিতীয় খণ্ডটি তিনি চুলোয় নিক্ষেপ করেন। পাণ্ডুলিপিটি যখন পুড়তে থাকে তখন তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন। টলস্টয়কে তিনি বলেন, 'আমি কী করেছি দেখুন...শয়তানের কী অসীম শক্তি...আমাকে কোথায় সে ঠেলে নিয়ে গেছে দেখুন।'

'বাজে কথা', টলস্টয় উত্তর দিলেন। 'অত্যন্ত শুভ ইঙ্গিত! এর অর্থ আপনি পরে আরো ভালো লিখবেন।'

এই উৎসাহব্যঞ্জক কথা গোগলকে জীবন দান করে। তিনি উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ, আমার মাথার মধ্যে সবকিছুই আছে।' কিন্তু এরপর তিনি আর কখনো তাঁর চৌকি ত্যাগ করেননি। চোখ বন্ধ করে স্রেফ চৌকিতে শুয়ে থাকতেন। খেতেন না কিছুই। বলতেন, 'আমাকে স্পর্শ কর না।' বলতেন 'আমার কোনো যন্ত্রণা নেই, আমাকে শুধু একা থাকতে দাও।' ১৮৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর এই অকালমৃত্যু (মাত্র ৪৩ বছর বয়সে) যেমন আশ্চর্য তেমনি রহস্যময়। ডাক্তাররা কোনো মারাত্মক ব্যাধি তাঁর শরীরে খুঁজে পাননি। তাহলে তাঁর মৃত্যুর হেতু কী? সে কি মরার ইচ্ছা? একটা মিথ্যা এবং ভয়াবহ সমস্যা ঈশ্বর না শিল্প—এই টানাপোড়েনের কবল থেকে মুক্তি না-পেয়ে মৃত্যুকেই তাঁর আবশ্যক মনে হয়েছিল কি? গোগল প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারীদের যেমন টলস্টয়-তুর্গেনিভ এবং দস্তয়েভস্কি প্রমুখের জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য আদর্শ রেখে গিয়েছেন। তুর্গেনিভ বলেছেন : 'তিনি ছাঁচ। সেই ছাঁচ থেকেই আমরা বের হয়েছি।' তাঁর দুর্ভাগ্য, যে কাজের জন্য পৃথিবীতে তাঁর আগমন হয়েছিল তা যে কত ভালোভাবে তিনি সমাধা করেছিলেন তা তিনি কোনোদিন বুঝতে পারেননি।

অসুখী, অস্বস্ত এবং দ্বিধাবিভক্ত মানব নিকোলাই গোগল আজ প্রায় দেড়শ বছরের কাছাকাছি হল মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর শিল্প আজো সারা দুনিয়ায় পাঠকসমাজকে মুক্তি ও আনন্দের আস্বাদ দিয়ে চলেছে।

শহিদুল আলম
২২/২, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
হাতিরপুল, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচি

ওভারকোট ১৫
পাগলের দিনলিপি ৪০
সেন্ট জন দিবসের আগের সন্ধে ৫২
সরোচিনেৎসের মেলা ৬৪
নাক ৮৪

www.pathagar.com

অনুবাদক

ওভারকোট ॥ অরুণ সোম
পাগলের দিনলিপি ॥ অমল চন্দ
সেন্ট জন দিবসের আগের সন্ধে ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সরোচিনেৎসের মেলা ॥ ননী ভৌমিক
নাক ॥ অরুণ সোম

www.pathagar.com

ওভারকোট

কোনো এক ডিপার্টমেন্টে... কোন ডিপার্টমেন্টে সেটা না-হয় না-ই বললাম।... এই সব ডিপার্টমেন্ট, রেজিমেন্ট, রেজিমেন্ট আর দফতরের চেয়ে—এককথায় নানা শ্রেণীর পদস্থ চাকরিজীবী সম্প্রদায়ের চেয়ে বদমেজাজি আর কোনো কিছু হতে পারে না। আজকাল আবার যে-কোনো লোক ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত হলে সেটাকে সে গোটা সমাজের অপমান বলে গণ্য করে। শোনা যায় অতি সম্প্রতি—মনে করতে পারছি না কোন শহরের—কোনো এক পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে একটি নিবেদন আসে যাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন সরকারি হুকুম-নির্দেশ সব রসাতলে যেতে বসেছে এবং অযথাই উচ্চারিত হচ্ছে সরকারের পুণ্য নাম। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি তাঁর নিবেদনের সঙ্গে প্রেরণ করেন কোনো এক বিপুলায়তন রোমান্টিক রচনা, যেখানে প্রতি দশ পৃষ্ঠা অন্তর অন্তর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এক পুলিশ অফিসারের—সময় সময় আবার হদ্দ মাতাল অবস্থায়। সুতরাং কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপার যাতে না-ঘটে সেই জন্য যে-ডিপার্টমেন্টের কথা হচ্ছে, তাকে বরং আমরা কোনো 'এক ডিপার্টমেন্ট' বলেই উল্লেখ করব।

এমনি এক ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত কোনো এক কর্মচারী। কর্মচারীটিকে দেখতে খুব একটা আহা-মরি বলা চলে না : বেঁটেখাটো গড়নের, খানিকটা বসন্তের দাগওলা, খানিকটা কটা, এমনকি চোখের দৃষ্টিও তার খানিকটা ক্ষীণ, কপালের ওপরে ছোটোখাটো টাক, গালের দুপাশেই বলিরেখা আর মুখের রঙ, যাকে বলে অর্শরোগগ্রস্তের...কী আর করা যাবে! এর জন্য দায়ী সেন্ট পিটার্সবুর্গের জলবায়ু; পদমর্যাদার দিক থেকে (কেননা সকলের আগে আমাদের জানানো দরকার সে কোন শ্রেণীর কর্মচারী) সে ছিল সেই চিরকেলে কেরানি—যাকে বলে নিম্নপদস্থ কেরানি; আর একথা সুবিদিত যে যারা পাল্টা আঘাত করতে জানে না, তাদের কোণঠাসা করার প্রশংসনীয় অভ্যাস যাঁদের আছে সেই লেখকরা এদের নিয়ে হাসিঠাট্টা ও তামাসার চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। কর্মচারীটির পদবি ছিল বাশ্‌মাচ্‌কিন। খোদ পদবি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো এক কালে বাশ্‌মাক, অর্থাৎ পাদুকা থেকেই তার উদ্ভব; কিন্তু কখন, কোন সময় এবং কী ভাবে পাদুকা থেকে তার উদ্ভব, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। বাপ-ঠাকুর্দা, মায় শ্যালক এবং বলতে গেলে বাশ্‌মাচ্‌কিনরা সকলেই জুতো পরত—কেবল বছরে বার তিনেক তলি বদল করে। তার নাম ছিল আকাকি আকাকিয়েভিচ। নামটা পাঠকের কাছে খানিকটা অদ্ভুত এবং বানানো মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এটা মোটেই খুঁজে-পেতে বার করা নয়, পরিস্থিতি আপনা থেকে এমন দাঁড়ায় যে অন্য কোনো নাম দেবার উপায় ছিল না। ঘটনাটা আসলে যে ভাবে ঘটেছিল বলি। আকাকি আকাকিয়েভিচের জন্ম হয়—আমার যতদূর মনে পড়ে—২২ মার্চ রাতে। স্বর্গীয় মাতৃদেবী ছিলেন বড় চমৎকার মহিলা, জনৈক সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী। তিনি ভেবেছিলেন ছেলেটির যথারীতি ধর্মমতে নামকরণ করবেন। মাতৃদেবী তখনও দরজার মুখোমুখি

www.pathagar.com

একটি খাটে শুয়ে ছিলেন, তাঁর ডান পাশে ছিলেন ধর্মপিতা ইভান ইভানভিচ ইয়েরোশ্‌কিন—অতি চমৎকার মানুষ, সিনেটের একজন হেড ক্লার্ক; আর ছিলেন ধর্মমাতা—থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের স্ত্রী—অসাধারণ গুণী মহিলা আরিনা সেমিওনভ্‌না বেলোব্রিউশখবা। প্রসূতিকে শিশুর নাম হিসেবে বেছে নিতে বলা হল তিনটি নামের যে কোনো একটি : মোক্‌কি, সোস্‌সি অথবা শহিদ খোজ্‌দাজাতের। 'না, এগুলোর একটা নামও তিনি রাখবেন না, মা মনে মনে ভাবলেন, 'নামের কী ছিরি দেখ!' তাঁকে খুশি করার জন্য পঞ্জিকার আরও একটা জায়গা খোলা হল, এবারেও তিনটি নাম : ত্রিফিলি, দুলা ও ভারাখাসি। 'না, কোনো মায়ের পক্ষে সন্তানের এসব নাম রাখাকে শাস্তি ছাড়া কী বলা যায়?' প্রৌঢ়া শেষ পর্যন্ত বললেন, 'কী সব নাম! সত্যি বলছি বাপের জন্মেও শুনিনি। ভারাদাত কিংবা ভারুখ হলেও না-হয় বুঝতাম, তা নয়, ত্রিফিলি, ভারাখাসি।' আবারও পৃষ্ঠা ওল্‌টানো হল—বের হল পাভ্‌সিকাখি ও ভাখ্‌তিসি। প্রৌঢ়া তাতে বললেন, 'না এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমার ভাগ্যটাই খারাপ। তা-ই যদি হয় তাহলে বরং ওর বাপের নামেই নাম রাখা হোক ওর নাম। বাপ ছিল আকাকি, ছেলেও হোক আকাকি।' এই ভাবেই আকাকি আকাকিয়েভিচ নামের উদ্ভব। শিশুর জাতকর্ম হল; সেই সময় সে কেঁদে উঠল এবং এমন মুখভঙ্গি করল যেন আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পাচ্ছিল যে ভবিষ্যতে একজন নিম্নপদস্থ কেরানিই সে হবে।

মোদ্দা ঘটনাটা হল এই। ঘটা করে এই বৃত্তান্ত দিলাম এজন্যে যাতে পাঠক নিজেই দেখতে পারেন যে এই নামটা রাখা হয়েছিল প্রায় নিরুপায় হয়েই। কবে, কোন সময় সে ডিপার্টমেন্টে কাজ নিয়েছিল এবং কে তাকে নিয়োগ করেছিল তা কেউ স্মরণ করতে পারে না। কত বড় সাহেব, কত ওপরওলাই-না এলেন, গেলেন, কিন্তু সে রয়ে গেল সেই একই জায়গায়, একই অবস্থায়, সেই একই পদে—নকলনবিস কেরানি হয়ে; ফলে লোকের মনে অতঃপর এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল যে সে নির্ঘাত ঐ রকম কেরানির পোশাক পরে পুরোদস্তুর তৈরি অবস্থায় এবং মাথায় টাক নিয়েই পৃথিবীতে জন্মেছিল। ডিপার্টমেন্টে তার প্রতি কারও কোনো ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। সে যখন পাশ দিয়ে চলে যেত তখন দারোয়ানরা উঠে দাঁড়ান দূরের কথা, তার দিকে ফিরেও তাকাত না—ভাবটা এমন যেন রিসেপ্‌শন হল-এর ভেতর দিয়ে নেহাৎই একটা মাছি উড়ে গেল। তার সঙ্গে ওপরওলাদের ব্যবহার ছিল আবেগশূন্য ও স্বৈরাচারী ধরনের। কোনো এসিস্টেন্ট হেড ক্লার্ক হলে তিনি সরাসরি ওর নাকের সামনে কাগজ বাড়িয়ে দিতেন—'নকল করুন' কিংবা 'এই যে একটা ছোটোখাটো চমৎকার ইন্টারেস্টিং কাজ' জাতের কথা বলার সৌজন্যটুকুও দেখাতেন না কিংবা ভদ্র চাকরির জগতে যে-সমস্ত শিষ্টাচার প্রয়োগের রীতি আছে তা দেখানোর দরকারও মনে করতেন না। সে-ও কেবল কাগজটার দিকে তাকিয়ে সেটা নিয়ে নিত, একবার তাকিয়েও দেখত না কে তাকে কাগজটা দিল এবং দেবার অধিকার আদৌ সেই ব্যক্তির আছে কিনা। কাগজটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ বসে যেত লিখতে। ছোকরা কর্মচারীরা তাদের কেরানিসুলভ রসিকতায় যতদূর কুলোয়, তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, তার সামনেই বলত তার সম্পর্কে যত রাজ্যের বানানো গল্প; তার বাড়িওলি সত্তর বছরের বুড়ি সম্পর্কে বলত সে নাকি ওকে মারে, প্রশ্ন করত কবে ওদের বিয়ে হচ্ছে, তার মাথার উপর কাগজের কুটি ছড়িয়ে দিয়ে বলত বরফ পড়ছে। কিন্তু এর জবাবে আকাকি আকাকিয়েভিচ একটি কথাও বলত না—যেন তার সামনে কেউ নেই; এমনকি তার কাজের ওপরও এর কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটাত না; এতসব হাসিতামাশার মাঝখানে সে লেখায় একটা ভুলও করত না। কেবল ঠাট্টাটা বড় বেশি অসহ্য হয়ে উঠলে, যখন ওরা তার হাতে ঠেলা মেরে

www.pathagar.com

কাজের ব্যাঘাত ঘটাত, তখনই সে বলত : 'ছেড়ে দিন আমাকে, আপনারা আমাকে অপমান করছেন কেন?' তার এই কথায় এবং যে রকম কণ্ঠস্বরে কথাগুলো উচ্চারিত হত, তাতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব থাকত। সেখানে কাতরতায় ভেঙে পড়া এমন একটা ভাব ফুটে উঠত যে সদ্য চাকরিতে-ঢোকা এক যুবক তো অন্যদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে তাকে নিয়ে উপহাস করতে গিয়ে থমকেই গেল—যেন আচমকা তার বুকে শেল বিঁধেছে। আর তারপর থেকেই সেই যুবকের সামনে সবকিছু যেন বদলে গেল, মানবজাতিটাই প্রায় দেখা দিল অন্য রূপে। ভদ্র, মার্জিত লোক ভেবে যাদের সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছিল কোনো এক অপ্রাকৃত শক্তি যেন তাকে সেই বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। এরপর দীর্ঘকাল, চরম আনন্দের মুহূর্তে তার মনে পড়ে যেত মাথার সামনের দিকে টাক-পড়া, বেঁটেখাটো চেহারার কেরানিটিকে আর তার সেই মর্মভেদী কথাগুলো : 'ছেড়ে দিন আমাকে, আপনারা আমাকে অপমান করছেন কেন?'—এই মর্মভেদী কথাগুলোর মধ্যে যেন অনুরণিত হত আরও একটি ইঙ্গিত : 'আমি তোমার ভাই!' আচমকা কথাগুলো শুনে বেচারি যুবকটি হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলছিল এবং পরবর্তীতে জীবনে তাকে বহুবার একইভাবে আঁতকে উঠতে হয়েছে, যখন সে দেখতে পেয়েছে কতই-না অমানুষিকতা মানুষের মধ্যে, কতই-না নিষ্ঠুর স্থূলতা গোপন থাকে মার্জিত, শিক্ষা ও ভদ্রতার আড়ালে! হা ঈশ্বর! এমনকি সেইসব মানুষের মধ্যেও, যাদের বিশ্বসুদ্ধ সকলে উদার ও সৎ বলে জানে...

এমন লোক আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার যার কাছে চাকরিই ছিল জীবনের ধ্যানজ্ঞান। কম বলা হবে যদি বলি সে কাজ করত প্রবল আগ্রহ নিয়ে—না, সে কাজ করত ভালোবাসা দিয়ে। এখানে, এই নকল করার মধ্যে সে দেখতে পেত নিজস্ব এক বৈচিত্র্যময় ও মধুর জগৎ। তার চোখেমুখে ফুটে উঠত একটা তৃপ্তির ভাব। কতকগুলো অক্ষর ছিল তার বিশেষ প্রিয়, সেগুলোকে পেলে সে আত্মহারা হয়ে যেত; তার মুখে ফুটে উঠত মৃদু হাসি, সে চোখ টিপত, ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করত, ফলে তার কলমে ফুটে-ওঠা প্রতিটি অক্ষর যেন পাঠ করা যেত তার মুখের রেখা থেকে। তার উৎসাহের সমপরিমাণে যদি তাকে পুরস্কার দেয়া যেত তাহলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকত না—সে সরকারি পরামর্শদাতা অবধি বনতে পারত, কিন্তু কাজের পুরস্কার বলতে সে যা পেল—তার অফিসের রসিক বন্ধুদের কথায়—তা হল বোতামঘরে লাগানোর একটা ব্যাজ আর নিম্নাঙ্গে অর্জিত অর্শরোগ। প্রসঙ্গত, তার প্রতি কারও কোনো মনোযোগ ছিল না এ-কথা বলাও ঠিক হবে না। কোনো এক সদাশয় বড়সাহেব দীর্ঘকালীন চাকরির জন্য তাকে পুরস্কৃত করার বাসনায় হুকুম দিলেন তাকে যেন মামুলি নকল করার কাজ না-দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়; তাকে যা করতে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তা হল পুরোপুরি তৈরি একটা কেস থেকে অন্য আরেকটি অফিসের জন্য রিপোর্ট লেখা; শিরোনামা বদল করা আর ক্ষেত্রবিশেষে ক্রিয়াপদ উত্তমপুরুষ থেকে প্রথম পুরুষে পালটে দেওয়া—স্রেফ এই ছিল কাজ। এটা তার কাছে এমনই দুরূহ ঠেকল যে সে গলদঘর্ম হয়ে উঠল, কপালের ঘাম মুছে শেষকালে বলল : 'না, আমাকে বরং কিছু নকল করতেই দিন।' এরপর থেকে তাকে নকলনবিস কেরানি করেই রেখে দেওয়া হল চিরকালের জন্য। এই নকল করার বাইরে তার কাছে যেন আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সে তার নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাত না। তার অফিসের ইউনিফর্মটা আর সবুজ নেই, এখন কেমন যেন একটা লালচে বাদামি, ময়দা-ময়দা রঙ ধারণ করেছে। ইউনিফর্মের কলারটা ছিল সরু, নিচু, ফলে তার ঘাড় লম্বা না হলেও কাঁধ থেকে

www.pathagar.com

বেরিয়ে পড়ায় অসাধারণ লম্বা দেখাত—প্লাস্টারের তৈরি মাথা নড়বড়ে সে-সমস্ত বিড়ালছানা-পুতুল রুশি ফিরিওয়ালারা ডজনে-ডজনে মাথায় বয়ে নিয়ে ফেরি করে বেড়ায়, অনেকটা তেমনি। আর তার ইউনিফর্মে খড়ের টুকরো কিংবা সুতো—একটা না একটা কিছু সব সময় লেগে থাকত; তায় আবার লোকে যখন জানলা দিয়ে যত রাজ্যের আবর্জনা বাইরে ছুড়ে ফেলছে, রাস্তায় চলতে গিয়ে সময় বুঝে ঠিক সেই মুহূর্তেই জানলার নিচে দিয়ে চলার একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার। ফলে সে নিত্য তার টুপিতে বয়ে নিয়ে বেড়াত তরমুজ ও ফুটির খোসা এবং ঐ ধরনের যত জঞ্জাল। রাস্তায় রোজ কী হচ্ছে না-হচ্ছে সেদিকে সে জীবনে কখনও মনোযোগ দিত না; অথচ কে না-জানে যে তারই সতীর্থ যুবক কর্মচারীটি তা দেখার ব্যাপারে আগ্রহী? শুধুই কি তাই?—সে লোকটি নিজের দৃষ্টিশক্তি এতদূর প্রখর করে তুলেছে যে ওপাশের ফুটপাথে কারও প্যান্টের গ্যালিস আলগা হয়ে গেলে তা-ও তার নজরে এড়াবে না—আর এমন ঘটনা তার মুখে মৃদু বিদ্রূপের হাসির উদ্রেক অবশ্যই করবে।

কিন্তু সে দিকে যদি আকাকি আকাকিয়েভিচের দৃষ্টি পড়ত তা হলেও সবকিছুর মধ্যে সে দেখতে পেত তার নিজের পরিচ্ছন্ন, গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা লাইন; কেবল যখন, কোথা থেকে কে জানে, কোনো উটকো ঘোড়া এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে ব্যাঘাত ঘটাত এবং নাকের ফুটো দিয়ে দমকা হাওয়া তার গালের উপর ছেড়ে দিত, একমাত্র তখনই তার খেয়াল হত যে সে কোনো লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় নেই, আছে রাস্তার মাঝখানে। বাড়িতে ফিরে এসে সে তৎক্ষণাৎ টেবিলের ধারে গিয়ে বসে পড়ত, স্বাদের তোয়াক্কা না করে চটপট গিলত বাঁধাকপির সুপ, পিঁয়াজ সহযোগে গোমাংসের টুকরো। মাছি এবং আরও কিছু যদি ঈশ্বর সেই সময় পাঠিয়ে দিতেন তাহলে খাবারের সঙ্গে তা-ও সে গলাধঃকরণ করত। পাকস্থলি ফুলে উঠতে শুরু করেছে দেখে সে উঠে দাঁড়াত টেবিল ছেড়ে, বাড়িতে যে-সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে এসেছে সেগুলো নকল করত। সে-রকম কোনো কাগজ না থাকলে নিজের তৃপ্তির জন্য, ইচ্ছে করে নিজের জন্য সে নকল করত, বিশেষত কাগজটা যদি হত অসামান্য—রচনাশৈলীর সৌকর্যে নয়—কোনো নতুন নতুন অথবা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির উদ্দেশে লেখা বলে।

আকাকি আকাকিয়েভিচ কখনও কোনো রকম আমোদপ্রমোদের প্রশ্রয় দিত না। যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গের ধূসর আকাশ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে যায় এবং গোটা কেরানিকুল, যে যেমন পারে, যার যার আয় ও রুচি অনুযায়ী খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়, যখন ডিপার্টমেন্টে কলম-ঘষটানো সাঙ্গ করার পর, নিজেদের ও অন্যদের ডিপার্টমেন্টের অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মে ছুটোছুটির পর, বড় ছটফটে এই লোকগুলো স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত কাজগুলো সেরে যখন তাদের বাকি সময়টুকু উপভোগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে : যারা একটু বেশি চট্‌পটে স্বভাবের তারা থিয়েটারে ছোটে; কেউ-বা রাস্তাঘাটে ঘুরে মহিলাদের মাথার টুপি নিরীক্ষণ ক'রে আমোদ পায়; কেউ যায় সান্ধ্য আসরে—অফিস কর্মচারীদের ছোটোখাটো মহলের তারকা, কোনো রূপসী তরুণীর উদ্দেশে গদগদ প্রশস্তি ঢালে; কেউ-বা—আর এটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে—যায় স্রেফ তার অফিসের বন্ধুর কাছে, চারতলা অথবা তিনতলার ফ্ল্যাটে, যেখানে আছে দুটো ছোটো ছোটো ঘর, যেখানে সামনের হলঘর কিংবা রান্নাঘর জাঁক দেখানোর মতো শৌখিন জিনিসে, ল্যাম্পে কিংবা অন্য কোনো টুকিটাকিতে সাজানো, যেগুলো কিনতে গিয়ে উৎসর্গ করতে হয়েছে অনেক কিছু, পরিত্যাগ করতে হয়েছে দৈনন্দিন আহার এবং পানভোজন—মোট কথা, যখন সমস্ত অফিস কর্মচারীরা তাদের বন্ধুবান্ধবদের ছোটো

www.pathagar.com

ছোটো ফ্ল্যাটে দলে দলে এসে জুটে ফ্ল্যাশ খেলে, মড়মড়ে করে সেঁকা সস্তা রুটি সহযোগে গেলাসে করে চায়ে চুমুক মারে, লম্বা কাঠের পাইপে ধোঁয়া টানে, তাস বাটার সময় উঁচু মহলের এমন কোনো কেচ্ছাকাহিনী বলে যা থেকে কোনো রুশি মানুষকে কখনও, কোনো অবস্থাতেই নিবৃত্ত করা যায় না, অথবা নিদেনপক্ষে, যখন কোনো কথা বলার থাকে না, হাজার বার বলে সেই বস্তাপচা চুটকি কোনো এক কমান্ডান্ট সম্পর্কে, যার কাছে সংবাদ এসেছিল যে ফাল্‌কনে'র স্মৃতিমূর্তির লেজ কাটা গেছে—অর্থাৎ কিনা, যখন সকলে আমোদপ্রমোদে মেতে ওঠার জন্য উন্মুখ, এমনকি সেইসব মুহূর্তেও আকাকি আকাকিয়েভিচ কোনো রকম আমোদপ্রমোদের প্রশ্রয় দিত না। তাকে কখনও কোনো সান্ধ্য আসরে দেখা গেছে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। লেখার পর পরম পরিতৃপ্তিভরে সে বিছানায় শুতে যেত আর আগামীকালের কথা ভেবে, আগামীকাল নকল করার জন্য কিছু একটা ঈশ্বর তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন এই কথা মনে করে সে খুশি হয়ে হাসত। এইভাবে বয়ে চলছিল এমন একজন মানুষের শান্ত জীবনযাত্রা, যে বছরে চারশ' রুব্‌ল মাইনে পেয়ে নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মতো ক্ষমতা রাখত। এইভাবে হয়তো জীবন বয়েই চলত চরম বার্ধক্য পর্যন্ত, যদি-না জীবনের পথে ছড়ানো থাকত নানা ধরনের বিপদ-আপদ, যা কেবল নিম্নপদস্থ কেরানির নয়, প্রিভি কাউন্সিলর, একান্ত সচিব, রাজ্যসচিব ও বিভিন্ন সরকারি পরামর্শদাতার—এমনকি যাঁরা কাউকে পরামর্শ দেন না, নিজেরাও কারও কাছে থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন না—তাঁদেরও জীবনের পথেও ছড়ানো থাকে।

যারা বছরে চারশ' রুব্‌ল বা তার কাছাকাছি মাইনে পায়, সেন্ট পিটার্সবুর্গে তাদের সকলের এক প্রবল শত্রু আছে। এই শত্রুটি আর কেউ নয়—আমাদের উত্তরের হিম, যদিও লোকে অবশ্য বলে থাকে যে স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা খুবই ভালো। সকাল নয়টার সময়, ঠিক সেই সময়টাতে,যখন রাস্তাঘাট ডিপার্টমেন্টগামী কর্মচারীতে ছেয়ে যায়, তখন সে কোনো বাছবিচার না করে সবার নাকের ওপর এত জোরে, এমন জ্বালাধরা টুসকি মারে যে বেচারি সরকারি কর্মচারীরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই সময় হিমে যখন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও কপাল কন্‌কন্‌ করতে থাকে এবং চোখ জল আসে, তখন নিম্নপদস্থ কেরানিরা মাঝে মাঝে হয়ে পড়ে অসহায়। বাঁচার একমাত্র উপায় হল পাতলা, জীর্ণ ওভারকোট গায়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুট দিয়ে পাঁচ-ছয়টা রাস্তা পেরিয়ে অফিসের সামনে দরোয়ানের ঘরে এসে আচ্ছা করে মেঝেতে পা ঠোকা, যতক্ষণ-না এই উপায়ে, রাস্তায় জমে যাওয়া তাদের যাবতীয় চাকরিজীবী ক্ষমতা ও প্রতিভার আড় ভাঙে। কিছুকাল হল আকাকি আকাকিয়েভিচ অনুভব করছে যে প্রয়োজনীয় দূরত্বটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে পেরোনোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার পিঠ এবং কাঁধ বিশেষ করে কেমন যেন একটু বেশি মাত্রায় কন্‌কন্‌ করছে। শেষ পর্যন্ত সে ভাবল এটা তার ওভারকোটের কোনো ত্রুটি নয় তো? বাড়িতে ওভারকোটটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর সে আবিষ্কার করল দুটো-তিনটে জায়গায়, ঠিক পিঠে এবং কাঁধেই, সেটা হয়ে গেছে, জিরজিরে বস্তার কাপড়ের মতো : বনাতটা ঘষা খেয়ে খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ভেতরের লাইনিং ছিঁড়ে ফেঁসে গেছে।

এখানে আপনাদের জানা দরকার যে আকাকি আকাকিয়েভিচের ওভারকোটও অফিসের অন্যান্য কেরানিদের ঠাট্টাবিদ্রূপের বস্তু; এমনকি 'অভিজাত ওভারকোট' আখ্যাটি বাতিল করে দিয়ে ওটার নাম দেওয়া হয়েছিল আলখিল্লা। আসলে ওভারকোটটার গড়নই ছিল কেমন যেন একটু বেঢপ গোছের : কলারটাকে ওভারকোটের অন্যান্য অংশ জুতসই করে তোলার কাজে লাগানোর ফলে বছরের পর বছর ক্রমেই হ্রস্বকায় হয়ে আসছে। এই জুতসই করার কাজে দরজির শিল্পকর্মের কোনো নিদর্শন ছিল না, ফলে ওভারকোটটা

www.pathagar.com

দেখতে হয়েছিল হুবহু বস্তার মতো, কদাকার। ব্যাপারটা কী, দেখার পর আকাকি আকাকিয়েভিচ ঠিক করেছিল ওভারকোটটাকে নিয়ে যাবে দরজি পেত্রোভিচের কাছে। পেত্রোভিচ বাস করত চার তলার কোনো একটা জায়গায়, পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সেখানে যেতে হয়। সে তার টেরা চোখ ও মুখময় বসন্তের দাগ সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য গ্রাহকদের প্যান্টালুন ও টেইলকোট মেরামতের কাজ দস্তুরমতো ভালো চালিয়ে যেত—বলাই বাহুল্য যখন প্রকৃতিস্থ থাকত, এবং অন্য কোনো চাড় মাথার ভেতরে পোষণ করত না। এই দরজিটি সম্পর্কে অবশ্য বেশি কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যেমন দস্তুর, যেহেতু উপাখ্যানের প্রতিটি পাত্রপাত্রীর চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়াটাই রীতি, অতএব আমি নাচার—পেত্রোভিচকেও এখানে টেনে আনতে হচ্ছে।

গোড়ায় লোকের তাকে ডাকত স্রেফ গ্রিগরি নামে। সে ছিল কোনো এক জমিদারের ভূমিদাস। পেত্রোভিচ পরিচয় তার শুরু হল তখন থেকে যখন ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর সে পালা-পার্বণ উপলক্ষে, মাত্রাতিরিক্ত পান করতে লাগল—প্রথম প্রথম বড় বড় উৎসব উপলক্ষে, অতঃপর নির্বিচারে যে-কোনো ধর্মীয় উৎসবে। পঞ্জিকায় ক্রুশচিহ্ন থাকলেই পান শুরু করত সে। এদিক থেকে সে তার পিতৃপুরুষের রেওয়াজের অনুগামী ছিল এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলে তাকে বিষয়ী মহিলা ও জার্মান বলত। স্ত্রীর প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন তার সম্পর্কেও দুটি কথা বলতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল এইটুকুই জানা গেছে যে পেত্রোভিচের স্ত্রী আছে আর সে মাথায় লেসের টুপি পরলেও রুমাল বাঁধে না। সৌন্দর্য নিয়ে তার দেমাক করার মতো কিছু নেই; তাকে দেখে বড়জোর রক্ষীবাহিনীর সৈন্যরা লেসের টুপির কানার নিচে উঁকি মেরে গোঁফজোড়া নাচাত আর গলা থেকে বার করত একটা বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ।

যে সিঁড়ি বয়ে পেত্রোভিচের কাছে যেতে হচ্ছে, যথাযথ বর্ণনা দিতে গেলে, সেটা আগাগোড়া জলে আর এঁটোকাঁটায় একাকার, আর তার সর্বত্র এমন একটা ঝাঁঝাল গন্ধ যে চোখ জ্বালা করে। সকলেই জানেন যে সেন্ট পিটার্সবুর্গের যে-কোনো বাড়ির পেছনের সিঁড়ির এটা হল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাই হোক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই আকাকি আকাকিয়েভিচ ভাবতে লাগল পেত্রোভিচ কত চাইতে পারে, আর মনে মনে এটাও ঠিক করে নিল যে তাকে দু'রুব্‌লের বেশি সে দেবে না। দরজা খোলাই ছিল। গৃহকর্ত্রী কোনো একটা মাছ রান্না করতে গিয়ে রান্নাঘরে এত বেশি ধোঁয়ার আমদানি করে ফেলেছিল যে আরসোলা পর্যন্ত নজরে পড়ার উপায় ছিল না—কাজেই আকাকি আকাকিয়েভিচ যে কখন রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেল তা খোদ কর্ত্রীরও চোখে পড়ল না। ঘরে ঢুকে সে দেখতে পেল একটা রঙ-না-করা চওড়া কাঠের টেবিলের উপর জোড়াসন করে তুর্কি পাশার ভঙ্গিতে বসে আছে পেত্রোভিচ। দরজিরা সচরাচর যেমনভাবে কাজে বসে, সে-ও তেমনি বসে ছিল খালি পায়ে। প্রথমেই আকাকি আকাকিয়েভিচের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার অতি পরিচিত বুড়ো আঙুলের নখটার ওপর—কচ্ছপের খোলের মতো শক্ত ও মোটা সেই নখ, কেমন যেন বিকৃত। পেত্রোভিচের গলায় ঝুলছিল সুতো ও রেশমের লাচ্ছি আর তার কোলের উপর ছিল একটা পুরনো কাপড়ের ফালি। সে মিনিট তিনেক ধরে ছুঁচের ফুটোয় সুতো গলানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হতে না পেরে অন্ধকারের ওপর, এমনকি সুতোর ওপরও চটে গিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে গজগজ করছিল; 'এটা ছাই ফুটো দিয়ে গলেও না; আবার আমাকে তিতি-বিরক্ত করে ছাড়ে, কী আপদরে বাবা!' আকাকি আকাকিয়েভিচ এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়ল যে সে এমন একটা মুহূর্তে এসে পড়েছে যখন পেত্রোভিচ রেগে টং হয়ে আছে। সে পেত্রোভিচকে ফরমাস দেওয়া পছন্দ করত তখনই যখন পেত্রোভিচ বেশ খানিকটা রঙে থাকত, কিংবা পেত্রোভিচের

www.pathagar.com

স্ত্রীর ভাষায়, যখন 'কড়া চোলাইয়ের কৃপায় কানা শয়তান ঝিম মেরে' থাকত। এই অবস্থায় পেত্রোভিচ সচরাচর নিজের দাবিদাওয়া ছেড়ে দিয়ে রফা করার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখাত, এমনকি মাথা বারবার নোয়াত, ধন্যবাদ জানাত, কাজ করতে চাইত কম দামে। কিন্তু তারপরেই অবশ্য আসত তার স্ত্রী, কাঁদতে কাঁদতে বলত যে স্বামী মাতাল অবস্থায় ছিল, তাই সস্তায় কাজ করতে রাজি হয়ে গেছে; তবে তাতে বড়জোর আর দশটা কোপেক যোগ করতে হবে—তাহলেই কাজ তোমার হাসিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পেত্রোভিচ প্রকৃতিস্থ, আর সেই কারণে, কড়া মেজাজের, একগুঁয়ে—কত দর হেঁকে বসে কে জানে? আকাকি আকাকিয়েভিচ মনে মনে এটা আঁচ করে যাকে বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, সেই পন্থাই অবলম্বনে প্রবৃত্ত হল, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। পেত্রোভিচ নিজের একমাত্র চোখটা কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে ফেলেছে আর আকাকি আকাকিয়োভিচেরও মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে :

'নমস্কার পেত্রোভিচ!'

'আপনার কুশল কামনা করি', বলেই পেত্রোভিচ আড়চোখে তাকাল আকাকি আকাকিয়োভিচের হাতের দিকে, কী ধরনের শিকার সে এনেছে তা দেখার উদ্দেশে।

'পেত্রোভিচ, আমি মানে, আমি এসেছি...'

এখানে বলা দরকার যে আকাকি আকাকিয়েভিচ বেশির ভাগই এমন সমস্ত অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ এবং ঐ রকম আরও সব শব্দের সাহায্যে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করত যেগুলোর আদৌ কোনো অর্থ হয় না। ব্যাপার যখন বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াত তখন তার অভ্যাস ছিল বাক্য আদৌ শেষ না-করা, ফলে অতি ঘন ঘন 'মোদ্দা কথাটা হল এই যে...' বলে বক্তব্য শুরু করেও বাকিটা আর বলতে পারত না, নিজেই খেই হারিয়ে ফেলত, তার মনে হত যেন যা বলার বলে ফেলেছে।

'কী ব্যাপার?' বলার সঙ্গে সঙ্গে পেত্রোভিচ তার একমাত্র চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আকাকি আকাকিয়েভিচের গোটা ইউনিফর্মটা—কলার থেকে শুরু করে হাতা, পিঠ, পেছনের অংশের কিনারা পর্যন্ত—তার অতিপরিচিত এসব, যেহেতু তারই হাতের কাজ এটা।

এটাই হল দরজিদের দস্তুর—কোনো খদ্দেরকে দেখলে প্রথমে তারা যা করে থাকে।

'হ্যাঁ ব্যাপারটা হল এই পেত্রোভিচ... আমার এই ওভারকোটটা... এর বনাতটা... দেখতে পাচ্ছ, বাদবাকি সব জায়গায় বেশ মজবুত আছে, খানিকটা ধুলো জমেছে এই যা, আর তাই মনে হচ্ছে যেন পুরনো, অথচ এটাকে নতুনই বলা চলে, এই তো কেবল একটা জায়গায়... পিঠের দিকে, আর এই কাঁধের একটা জায়গায় খানিকটা ফেঁসে গেছে, আর এই যে এই কাঁধটাতেও খানিকটা—দেখতেই পাচ্ছ আর কোথাও নেই। কাজও তেমন একটা বেশি সময়ের নয়...'

পেত্রোভিচ আলখিল্লাটা তুলে নিয়ে প্রথমে সেটাকে টেবিলের উপর বিছিয়ে রাখল, অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করল, মাথা নাড়ল, তারপর জানলার তাকের দিকে হাত বাড়াল একটা গোল নস্যিদানের উদ্দেশে, যেটার উপর কোনো এক জেনারেলের প্রতিকৃতি আঁকা—ঠিক কোন জেনারেলের তা জানার উপায় নেই, কেননা যে জায়গায় জেনারেলের মুখটা ছিল সেটা আঙুলের খোঁচায় ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ায় একটা চারকোণা কাগজের টুকরো তার উপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নস্যি টানার পর পেত্রোভিচ আলখাল্লাটা হাতে করে আলোর সামনে মেলে ধরে নিরীক্ষণ করে ফের মাথা নাড়ল। তারপর লাইনিং উল্‌টে দেখল, মাথা নাড়ল এবারেও, কাগজের টুকরো সাঁটা জেনারেলের প্রতিকৃতিশোভিত ঢাকনাটা খুলল, নাকে নস্যি গোঁজার পর নস্যিদানটি বন্ধ করে লুকিয়ে রাখল, অবশেষে বলল :

'না মেরামত করা যাবে না : পোশাকটার দফা রফা হয়ে গেছে!'

www.pathagar.com

এই কথায় আকাকি আকাকিয়েভিচের বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'কেন যাবে না পেত্রোভিচ?' প্রায় শিশুর মতো করুণ সুরে বলে উঠল সে। 'কেবল কাঁধ দুটোই ফেঁসে গেছে এই যা, তোমার কাছে কিছু টুকরোটাকরা আছে তো...'

'আরে টুকরোটাকরা তো খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে, সে পাওয়া যাবে', পেত্রোভিচ বলল, 'কিন্তু সেলাই করে জোড়া লাগান যাবে না : জিনিসটা একেবারেই পচে গেছে, ছুঁচ দিয়ে ছুঁতে না-ছুঁতে খসে পড়ে যাবে সব।'

'তা খসে পড়ে যাক গে, তুমি না-হয় সঙ্গে সঙ্গে তালি লাগিয়ে দিও।'

'কিন্তু তালি যার উপর লাগাব সেই জায়গাই তো নেই, তালিটা লেগে থাকবে কিসের উপর? আদত কাপড়টা তো টেকসই হওয়া চাই। এককালে বনাতটা ভালোই ছিল কিন্তু এখন জোর হাওয়া বইলেই হল—টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে।'

'কিন্তু কোনো রকমের জোড়াতালি লাগিয়ে দাও না। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, মানে, কী করে...

'না', পেত্রোভিচ জোর দিয়ে বলল, 'কিছুই করার নেই। একেবারেই সঙ্গীন অবস্থা। বরং কড়া ঠাণ্ডার সময় যখন আসবে তখন এটা কেটে বুটজুতোর ভেতরের ফেটি বানিয়ে পরুন, কেননা আপনার মোজায় পা গরম হয় না। ঐ মোজাটোজা বেরিয়েছে জার্মানদের মাথা থেকে, লোকের কাছ থেকে বেশি টাকা মারার মতলবে (পেত্রোভিচ সুযোগ পেলেই জার্মানদের খোঁচা দিয়ে কথা বলে); আর ওভারকোট আপনার! একটা নতুনই বানাতে হবে।'

'নতুন' শব্দটা শোনামাত্র আকাকি আকাকিয়েভিচ চোখে সরষে ফুল দেখল, আর ঘরের ভেতরে যা কিছু ছিল সে সবই তার সামনে গুলিয়ে যেতে লাগল। একমাত্র একটা জিনিস সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তা হল পেত্রোভিচের নস্যিদানির ঢাকানায় জেনারেলের কাগজ-সাঁটা মুখ।

'নতুন? সে কী করে হয়?' এমন ভাবে সে কথাগুলো বলল যেন তখনও স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছে সে। 'এর জন্য যত টাকার দরকার তা যে আমার নেই!'

'হ্যাঁ, নতুন', নিষ্ঠুরতা মেশানো শান্ত স্বরে বলল পেত্রোভিচ।

'আর যদি নতুন বানাতেই হয় তা হলে তার জন্য কী রকম...'

'মানে, বলতে চান কত পড়বে?'

'হ্যাঁ।'

'এই ধরুন তিনটে পঞ্চাশ রুব্‌লের পাতি কিংবা তার সামান্য কিছু বেশি', পেত্রোভিচ অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে বলল।

তীব্র প্রতিক্রিয়া খুব বেশি পছন্দ করত লোকটা, হঠাৎ কাউকে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি করে দিয়ে এই ধরনের কথার পর হতবুদ্ধি ব্যক্তির মুখের চেহারা কেমন হয় তা আড়চোখে দেখতে পছন্দ করত।

'একটা ওভারকোটের জন্য দেড়শ' রুব্‌ল!' বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ আর্তনাদ করে উঠল; চিরকাল মৃদু কণ্ঠস্বর জন্য যার বৈশিষ্ট্য, জীবনের বোধহয় এই প্রথম তার কণ্ঠস্বর চড়ল।

'হ্যাঁ মশাই', পেত্রোভিচ বলল, 'তা-ও আবার দেখতে হবে কেমন ওভারকোট। যদি নেউলের লোমের কলার চান আর রেশমের লাইনিং দেওয়া মাথা-ঢাকনা পছন্দ করেন তাহলে দুশ' ছাড়িয়ে যাবে।'

'আমার কথাটা একবার শোন, পেত্রোভিচ', পেত্রোভিচের কথা আর তার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার দিকে কর্ণপাত না করে, কর্ণপাতের কোনো চেষ্টা না করে অনুনয়ের সুরে সে

www.pathagar.com

বলল, 'কোনো মতে জোড়াতালি লাগিয়ে দাও যাতে অন্তত আরও কিছুটা কাল চলে যায়।'

'আরে না না, এর মানে হবে মিছিমিছি কাজ করা আর খামোকা টাকা খরচ করা', পেত্রোভিচ এই কথা বলার পর আকাকি আকাকিয়েভিচ সম্পূর্ণ ভগ্নমনোরথ হয়ে প্রস্থান করল।

সে চলে যাবার পর পেত্রোভিচ আরও অনেকক্ষণ অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল, কাজে হাত না-দিয়ে। সে তৃপ্তি পাচ্ছিল এই ভেবে যে নিজের ইজ্জত সে নষ্ট করেনি, আর সূচিশিল্পের প্রতি বেইমানিও করেনি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আকাকি আকাকিয়েভিচের মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

'ব্যাপারটা তা হলে এই', সে আপন মনে বলল; 'আমি ভাবতেই পারিনি যে ব্যাপারটা এ-রকম দাঁড়াবে...' এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার যোগ করল : 'এই তা হলে ব্যাপার! শেষ অবধি তা-হলে এই দাঁড়াল! আমি তা-হলে আগে থাকতে একেবারেই আন্দাজ করতে পারিনি যে এমন হবে।' তাকে ঘিরে আবার নেমে এল দীর্ঘ নীরবতা, তারপর সে বলল : 'হুঁ, বোঝ কাণ্ড! বোঝ দেখি... একেবারে যাকে বলে আচমকা... তাহলে...এটা যে কোনো মতেই...কী যে অবস্থা!'

একথা বলার পর সে বাড়ির দিকে না গিয়ে আনমনে হাঁটা দিল সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। পথে এক কালিঝুলিমাখা চিমনিওলা আকাকি আকাকিয়েভিচের গা ঘেঁষে চলে যেতে তার একটা কাঁধ পুরোপুরি কালো হয়ে গেল; একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল—সেখানকার উপরতলা থেকে তার উপর ঝরে পড়ল একরাশ চুন। এসব কোনো কিছুর ব্যাপারেই তার হুঁশ ছিল না; এমন সময় গুমটিতে প্রহরারত এক কনস্টেব্‌ল্ যখন তার হাতিয়ার টাঙ্গিটা পাশে রেখে শিঙের নস্যিদান থেকে কড়া-পড়া হাতের তালুতে নস্যি ঝাড়তে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতে আকাকি আকাকিয়েভিচের হুঁশ ফিরে এল—তা-ও আবার তখনই যখন কনস্টেব্‌ল্‌টি তাকে বলল : 'আরে গেল যা, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? ফুটপাতে আর কোনো জায়গা নেই?' এর ফলে সে ফিরে তাকিয়ে বাড়ির দিকে মোড় নিতে বাধ্য হল। কেবল বাড়ি ফিরে এসেই তার গুছিয়ে ভাবনা চিন্তা-ক্ষমতা ফিরে এল, তার নিজের অবস্থার স্পষ্ট ও খাঁটি স্বরূপ সে অনুধাবন করতে পারল। এবার আর বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, যুক্তিতর্ক দিয়ে অকপটে সে নিজের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করল, যেমনভাবে মানুষ কোনো বিচক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে নিতান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপারে আলোচনা করে।

'না, এভাবে নয়', আকাকি আকাকিয়েভিচ বলল, 'এখন পেত্রোভিচের সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই : ওর অবস্থাটা এখন...দেখেশুনে মনে হয় বউ বোধহয় ওকে একচোট ধোলাই দিয়েছে। আমি বরং রোববার সকালে যাব; তার আগের দিনের—শনিবারের সন্ধের মৌজের পর সে যখন তেরছা চোখে তাকাবে আর ঢুলু ঢুলু অবস্থায় থাকবে, ঠিক তখনই দরকার হবে খোঁয়ারি ভাঙার। এই সময় আমি ওর হাতে গুঁজে দেব দশটা কোপেক, তাহলেই ও অনেকটা বাগে আসবে আর ওভারকোটটাও তখন...'

মনে মনে এই বিবেচনা করে আকাকি আকাকিয়েভিচ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পরের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর দূর থেকে যখন দেখতে পেল যে পেত্রোভিচের স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে, তখনই গিয়ে হাজির হল সটান পেত্রোভিচের কাছে। ঠিকই তাই, শনিবারের পর পেত্রোভিচের দৃষ্টি বেশ টেরিয়ে গেছে, তার মাথাটা ঝুঁকে আছে মেঝের দিকে, ভাবটা রীতিমতো ঢুলু ঢুলু; কিন্তু তা হলে কী হবে, সেই মুহূর্তে সে জানতে পারল আকাকি আকাকিয়েভিচের উদ্দেশ্যটা কী অমনি যেন শয়তান তার ওপর এসে ভর করল।

www.pathagar.com

'সে হয় না', পেত্রোভিচ বলল, 'নতুন ওভারকোটের ফরমাস দিতেই হবে আপনাকে।'

তাকে আর কথা বলতে না দিয়ে আকাকি আকাকিয়েভিচ দশটা কোপেক তার হাতে খুঁজে দিল।

'আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ মশাই, আপনার স্বাস্থ্য কামনায় সামান্য দু-এক ঢোক খেয়ে একটু বল পাব', পেত্রোভিচ বলল। 'তবে মাফ করবেন, ঐ ওভারকোটের কথা আর তুলবেন না : ওটা কোনো কাজেই আসবে না। আমি আপনাকে একটা নতুন ওভারকোট সেলাই করে দেব, খাসা বানিয়ে দেব, আর কোনো কথা নয়।'

আকাকি আকাকিয়েভিচ তখনও মেরামতের প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেত্রোভিচ কোনো আমল না দিয়ে বলল :

'নতুন ওভারকোট আমি আপনাকে সেলাই করে দেবই দেব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না। বিলকুল হাল ফ্যাশনেরই হবে : রুপোর বকলস-আঁটা কলারও বসানো যেতে পারে।'

আকাকি আকাকিয়েভিচ বুঝতে পারল যে নতুন ওভারকোট ছাড়া চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটাও একেবারে দমে গেল। আসলে কী উপায়ে, কী দিয়ে, কোন টাকায় তা বানানো সম্ভব? অবশ্য অংশত নির্ভর করা যেতে পারত উৎসব উপলক্ষে ভবিষ্যতে যে বোনাসটা পাওয়া যাবে তার ওপর, কিন্তু সেই টাকা বহুকাল হল খাটানো হয়ে গেছে, আগে থেকেই তার বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। নতুন প্যান্টালুন দরকার; পুরনো বুটজোড়ায় সোল্ লাগাতে হয়েছে—সেই বাবদ মুচির পাওনা পুরনো ঋণ শোধ দিতে হবে; সেলাইয়ের ফরমাস দিতে হয়েছে তিনটে জামার আর গোটা দুয়েক অন্তর্বাসের—যার উল্লেখ ছাপার অক্ষরে করা শিষ্টাচারসম্মত নয় : এতে প্রায় সব টাকাই পুরোপুরি খরচ হয়ে যাবে। এমনকি বড় সাহেব যদি তেমন দয়াপরবশ হয়ে চল্লিশ রুবলের বদলে পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ রুব্‌লও বোনাস দেন তবু যা বাঁচবে তা নিতান্তই নগণ্য—ওভারকোটের পুঁজি হিসেবে হবে সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। সে জানে যে অনেক সময় পেত্রোভিচ হঠাৎ খেয়ালের বশে এমন একটা বিতিকিচ্ছিরি রকমের চড়া দর হেঁকে বসে যে তার স্ত্রী পর্যন্ত স্থির না-থাকতে পেরে বলে ফেলে : 'এ কী কাণ্ড, খেপে গেলে নাকি, বুদ্ধু কোথাকার! অন্য সময় বিনি পয়সায় কাজ নেবে, আর এখন দেখ এমন এক দাম হেঁকে বসল, যে দরে ও নিজেও বিকোবে না।' সে আরও জানে যে পেত্রোভিচ আশি রুব্‌লেও কাজটা নিতে রাজি হবে; কিন্তু এই আশিটা রুব্‌লই-বা আসবে কোত্থেকে? খুঁজে পেতে দেখলে বড়জোর কুড়িয়ে কাড়িয়ে অর্ধেকটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে—এমনকি হয়তো-বা তার একটু বেশিও; কিন্তু বাকি অর্ধেক কোথায় পাওয়া যায়?... তবে, আগে পাঠকের জানা দরকার প্রথম অর্ধেকটা এল কোথা থেকে। আকাকি আকাকিয়েভিচের অভ্যাস ছিল খরচের প্রত্যেকটি রুব্‌ল থেকে একটি করে দু কোপেকের মুদ্রা সরিয়ে রাখা। সেগুলো রাখত সে চাবি দিয়ে আটকানো একটা ছোটো বাক্সের মধ্যে, বাক্সটার ঢাকনায় ছিল পয়সা ফেলার জন্য একটা ফুটো। প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর সে জমানো তামার মুদ্রা গুনে দেখে সেগুলোর বদলে সমান পরিমাণ খুচরো রুপোর মুদ্রা রাখত। এটা সে অনেক দিন যাবৎ করে আসছে। এই ভাবে কয়েক বছরে জমানো অর্থের পরিমাণ চল্লিশ রুবলেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং অর্ধেক হাতে আছে; কিন্তু বাকি অর্ধেক আসবে কোথা থেকে? কোথা থেকে আসবে বাকি চল্লিশ রুব্‌ল? আকাকি আকাকিয়েভিচ ভেবে ভেবে শেষকালে ঠিক করল তার রোজকার খরচপত্র কমাতে হবে—অন্তত এক বছরের জন্য তো বটেই : সন্ধ্যাকালীন চায়ের অভ্যাস তাকে ছাড়তে হবে, সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালানো চলবে না, আর নেহাৎই যদি দরকার হয় তা হলে বাড়িওয়ালির ঘরে গিয়ে তার মোমবাতির আলোয়

www.pathagar.com

কাজ করতে হবে; রাস্তায় চলতে গিয়ে যতদূর সম্ভব আলতো করে ও সন্তর্পণে, প্রায় আলগোছে, বাঁধানো ফলক ও খোয়ার উপর পা ফেলতে হবে যাতে জুতোর তলি তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে না-যায়; ধোপার বাড়িতে জামাকাপড় যতদূর পারা যায় কম ধুতে দিতে হবে, আর জামাকাপড় যাতে বেশি পরার ফলে ফেঁসে না-যায় তার জন্য বাড়িতে এসেই তা খুলে ফেলে পরতে হবে মোটা সুতি কাপড়ের ড্রেসিংগাউনটা—যদিও বহুকালের পুরনো, তবু খোদ সময় পর্যন্ত সেটার প্রতি কৃপাপরবশ। সত্যি কথা বলতে গেলে কী, প্রথম প্রথম এহেন বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে চলতে অভ্যস্ত হওয়া তার পক্ষে খানিকটা কঠিন মনে হল, কিন্তু পরে কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেল এবং সবকিছু ঠিকঠাক চলতে লাগল দিব্যি; এমনকি সন্ধ্যাবেলায় সম্পূর্ণ উপোস দেবার অভ্যাসও সে করতে লাগল কমবেশি; তার মনের খোরাক, একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ঐ ভবিষ্যতের ওভারকোট। এই সময় থেকে তার অস্তিত্বটাই কেমন যেন পূর্ণতর হয়ে উঠল, মনে হল যেন সে বিয়ে করেছে, যেন তার সঙ্গে সঙ্গে আছে অন্য একটি মানুষ, যেন সে আর একা নয়, যেন কোনো মোহিনী জীবনসঙ্গিনী জীবনের পথপরিক্রমায় তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে; সেই সঙ্গিনীটি আর কেউই নয়, সে হল মোটা তুলোয় ঠাসা, মজবুত লাইনিং দেওয়া, টেকসই সেই ওভারকোটটা। সে খানিকটা সজীব হয়ে উঠল, এমনকি তার চরিত্রও হয় উঠল আরও দৃঢ়—এমন একজন মানুষের মতো যার নির্দিষ্ট, বিশেষ লক্ষ্য আছে। তার মুখ থেকে, আচার-আচরণ থেকে আপনাআপনি মিলিয়ে গেল সংশয়, দ্বিধা—এককথায়, যাবতীয় ইতস্তত ও অনিশ্চিত ভাব। সময় সময় তার চোখে দেখা যেতে লাগল আলোর উদ্ভাস, এমনকি মাথার ভেতরে খেলে যেতে লাগল অতি দুঃসাহসী ও বেপরোয়া সব চিন্তা—আচ্ছা সত্যিই তো, কলারে নেউলের পশম লাগালে কেমন হয়? এই সমস্ত ভাবনাচিন্তা তাকে প্রায় অন্যমনস্ক করে ফেলতে লাগল। একবার তো কাগজে লেখা নকল করতে গিয়ে আরেকটু হলেই এমন একটা ভুল করে ফেলেছিল যে তার মুখ দিয়ে প্রায় জোরে 'উঃ!' আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল এবং ক্রুশ করে বসেছিল সে। প্রতি মাসে অন্তত একবার করে হলেও সে পেত্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে যেত ওভারকোট সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য, জানতে চাইত কোথায় পশমি কাপড় কেনা ভালো, কোন রঙের কেনা উচিত এবং কতই-বা দর হতে পারে; খানিকটা নিশ্চিত হলেও সবসময় বাড়ি ফিরে আসত সে উৎফুল্ল হয়ে, মনে মনে এই ভাবত যে অবশেষে এমন এক সময় আসবে যখন এই সবই হয়তো এক-এক করে কেনা হয়ে যাবে তার। কেনা হবে, সে যেমন আশা করেছিল তার চেয়ে যেন তাড়াতাড়িই এগিয়ে গেল সবকিছু। সমস্ত প্রত্যাশার মাত্রা ছাড়িয়ে বড় সাহেব আকাকি আকাকিয়েভিচকে যে বোনাস দিলেন তা চল্লিশ নয়, পঁয়তাল্লিশও নয়, পুরো ষাট রুব্‌ল : তিনি কি আঁচ করে ফেলেছিলেন, যে আকাকি আকাকিয়েভিচের ওভারকোট দরকার, নাকি অমনি অমনিই এমন কাণ্ড ঘটে গেল?—সে যাই হোক-না কেন, এভাবেই আকাকি আকাকিয়েভিচের হাতে এসে গেল বাড়তি বিশ রুব্‌ল। এই পরিস্থিতির ফলে কাজ দ্রুত এগিয়ে গেল। আরও দু-তিন মাস অল্পস্বল্প অনশনে কাটানোর পর আকাকি আকাকিয়েভিচের ঠিকই জমে গেল প্রায় আশি রুব্‌লের মতো। তার হৃৎপিণ্ড সাধারণত শান্ত থাকে, কিন্তু এখন তা রীতিমতো দ্রুত ওঠা-পড়া করতে লাগল। প্রথম দিনই সে পেত্রোভিচকে সঙ্গে নিয়ে গেল দোকানে। তারা একটা খুব চমৎকার পশমি কাপড়ের থান কিনল—এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা গত কয়েক মাস ধরেই তারা এ নিয়ে ভাবছিল এবং এমন মাস কদাচিৎ গেছে যখন তারা দোকানে ঘুরে ঘুরে দাম যাচাই করে দেখেনি; কাপড় দেখে পেত্রোভিচ নিজেও বলল যে এর চেয়ে ভালো পশমি কাপড় আর হয় না। লাইনিং-এর জন্য তারা পছন্দ করে কিনল ক্যালিকো। কাপড়টা এত টেকসই ও ঘন জমিনের যে পেত্রোভিচের কথায়,

www.pathagar.com

রেশমি কাপড়ের চেয়েও ভালো, এমনকি দেখতেও অনেক চমৎকার, অনেক চকচকে। নেউলের লোমশ চামড়া তারা কিনল না, সত্যি সত্যিই বেশ দাম ওর; তার বদলে তারা দোকানে খুঁজে পেতে যতটা ভালো পাওয়া যায় বিড়ালের চামড়া কিনল—এমনই চামড়া যাকে দূর থেকে যে কোনো সময় নেউলের চামড়া বলে মনে হবে। ভেতরে গদি পুরে অনেক ফোঁড় দিতে হবে বলে পেত্রোভিচকে পুরো দুটি সপ্তাহ ধরে ওভারকোট তৈরির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হল, এতটা না-করতে হলে অনেক আগেই তৈরি হয়ে যেত ওভারকোটটা। কাজের জন্য পেত্রোভিচ নিল বার রুব্‌ল—এর কমে এতটা না-করতে হলে সম্ভব নয় : খুদে খুদে দ্বিগুণ ফোঁড় দিয়ে সমস্তটা রেশমি সুতোয় চূড়ান্তভাবে সেলাই কোনোমতে করতে হয়েছে তাকে। আর প্রতিটি ফোঁড়ের ওপর পেত্রোভিচ পরে নিজের দাঁত চালিয়ে যাবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ অলঙ্করণ।

ঠিক কোন দিন তা বলা কঠিন—তবে সম্ভবত সেটা ছিল আকাকি আকাকিয়েভিচের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন—যে দিন শেষ পর্যন্ত পেত্রোভিচ বয়ে আনল ওভারকোটটা। নিয়ে এল ভোরবেলায়, যখন ডিপার্টমেন্টে যাওয়া দরকার তার ঠিক আগে আগে। ওভারকোটের পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর হয় না, কেননা ইতোমধ্যে রীতিমতো তীব্র হিম শুরু হয়ে গেছে এবং তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একজন ভালো দরজির মতো ভাব করে পেত্রোভিচ হাজির হল ওভারকোট নিয়ে। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল এমন একটা গুরুগম্ভীর ভঙ্গি যা আকাকি আকাকিয়েভিচ এর আগে কখনও দেখেনি। সে যেন পুরোমাত্রায় উপলব্ধি করতে পারছিল যে একটা বেশ বড় কাজ করে ফেলেছে; যে-সমস্ত দরজি নতুন পোশাক বানায় এবং যারা কেবলই লাইনিং সেলাই করে ও পোশাক মেরামত করে তাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এ সম্পর্কে হঠাৎ যেন সে সচেতন হয়ে পড়েছে। নাক মোছার বড় রুমালে করে সে বয়ে এনেছিল ওভারকোটটা—তার ভেতর থেকে সে ওটাকে বার করল : রুমালটা ছিল সদ্য-ধোপার বাড়ির কাচা। অতঃপর সে রুমাল ভাঁজ করে পকেটে পুরল ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে। ওভারকোটটা বের করার পর সে রীতিমতো গর্বভরে তাকিয়ে সেটাকে দু হাতে তুলে ধরে বেশ কায়দা করে আকাকি আকাকিয়েভিচের কাঁধে ছুড়ে দিল; পরে ওটাকে টেনেটুনে পেছনের দিকে নিচ পর্যন্ত হাত বুলিয়ে পাট করে দিল; এরপর বোতাম খোলা অবস্থাতেই ওভারকোটটা দিয়ে আকাকি আকাকিয়েভিচকে ঢেকে দিল। মধ্যবয়সী লোকের যেমন স্বভাব—আকাকি আকাকিয়েভিচ হাতা গলিয়ে ওটা পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পেত্রোভিচ হাতা গলিয়ে পরতেও সাহায্য করল তাকে—দেখা গেল হাতাও চমৎকার ফিট করেছে। মোটকথা, ওভারকোটটা গায়ে যেখানে যেমন লাগার দস্তুরমতো তেমনি লেগেছে। পেত্রোভিচ এই সুযোগে বলতে ছাড়ল না যে যেহেতু সে সাইনবোর্ড ছাড়া ছোটো রাস্তার উপর আছে, তায় আবার আকাকি আকাকিয়েভিচকে বহুকাল হল জানে, একমাত্র এই কারণেই এত কম দাম নিয়েছে; নেভ্‌স্কি এভিনিউতে গেলে একমাত্র কাজের জন্য তার কাছ থেকে নিয়ে নিত পঁচাত্তর রুব্‌ল। এ নিয়ে পেত্রোভিচের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছে আকাকি আকাকিয়েভিচের ছিল না, তা ছাড়া যে-সমস্ত চড়া চড়া অঙ্কের উল্লেখ করে পেত্রোভিচ লোককে হকচকিয়ে দিতে ভালোবাসত তাতে আকাকি আকাকিয়েভিচের ভয় ছিল। সে তার দাম শোধ করে দিয়ে ধন্যবাদ জানাল এবং তৎক্ষণাৎ নতুন ওভারকোট পরে রাস্তায় বেরিয়ে রওনা দিল ডিপার্টমেন্টের দিকে। পেত্রোভিচও তার পেছন পেছন বেরিয়ে এল। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে সে আরও অনেকক্ষণ ধরে দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওভারকোটটা। তারপর ইচ্ছে করে এক পাশে চলে গেল, বাঁক নিয়ে পাশের একটা আঁকাবাঁকা গলির ভেতরে

www.pathagar.com

ঢুকে পড়ে আবার বড় রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে এল অন্য পাশ থেকে অর্থাৎ সরাসরি সামনাসামনি তার ওভারকোটটাকে আরও একবার দেখার উদ্দেশ্যে। এদিকে আকাকি আকাকিয়েভিচ চলছিল পরম উল্লসিত হয়ে। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি মিনিটে সে অনুভব করছিল যে তার কাঁধে রয়েছে নতুন ওভারকোট, মনে মনে তৃপ্তি বোধ করে কয়েক বার মৃদু হাসলও সে। সত্যি কিন্তু লাভটা দু দিক থেকে : প্রথমত গরম, দ্বিতীয়ত দেখাচ্ছে দিব্যি। পথ সে আদৌ লক্ষ করল না, হঠাৎ এসে পড়ল ডিপার্টমেন্টে। প্রবেশপথে দারোয়ানের ঘরে সে ওভারকোটটা খুলল, চারপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে, দারোয়ানের বিশেষ হেফাজতে অর্পণ করল। কেমন করে যে ডিপার্টমেন্টে সকলে হঠাৎ জেনে গেল যে আকাকি আকাকিয়েভিচ নতুন ওভারকোটের অধিকারী হয়েছে, আলখিল্লা আর নেই। সকলে তৎক্ষণাৎ দারোয়ানের ঘরে ছুটে এল আকাকি আকাকিয়েভিচের নতুন ওভারকোট দেখতে। শুরু হয়ে গেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের পালা, ফলে গোড়ার দিকে সে কেবল হাসল, পরে তার কেমন যেন লজ্জাই হতে লাগল। সকলে যখন তার ওপর চড়াও হয়ে বলল যে নতুন ওভারকোট উপলক্ষে তার উচিত হবে সকলকে পানভোজনে, নিদেনপক্ষে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করা তখন আকাকি আকাকিয়েভিচ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল, বুঝতে পারল না তার কী করা উচিত, কী উত্তর দেওয়া যায়, কীভাবেই-বা তাদের ঠেকানো যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আগোগোড়া লাল হয়ে উঠে নেহাৎই সরল মনে তাদের বোঝাতে গেল যে ওভারকোটটা মোটেই নতুন নয়, আসলে এটা সেই পুরনোটাই। অবশেষে কর্মচারীদের একজন—এসিস্টেন্ট হেডক্লার্ক—তাঁর যে বিন্দুমাত্র দেমাক নেই এবং অধস্তনদের সঙ্গে পর্যন্ত মেলামেশায়ও কোনো আপত্তি নেই, সম্ভবত এটাই দেখানোর উদ্দেশ্যে বললেন:

'আপনারা যা বলছেন তা-ই হবে। আকাকি আকাকিয়েভিচের বদলে আমিই আপনাদের আপ্যায়ন করছি, আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ রইল : এমনই সৌভাগ্যজনক যোগাযোগ যে আজই আমার নামকরণের দিন।'

কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ এসিস্টেন্ট হেডক্লার্কটিকে অভিনন্দন জানাল এবং তার প্রস্তাব লুফে নিল সোৎসাহে। আকাকি আকাকিয়েভিচ ওজর-আপত্তি তুলতে গেল, কিন্তু সবাই বলতে লাগল যে এটা অভদ্রতা, স্রেফ লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। ফলে সে আর কোনো মতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। পরে অবশ্য তার ভালোই লাগল যখন মনে হল যে এই সুযোগে সে নতুন ওভারকোট পরে একটা সান্ধ্য আসরে পর্যন্ত যেতে পারছে। সমস্ত দিনটা আকাকি আকাকিয়েভিচের কাছে একটা মহাসমারোহপূর্ণ বিরাট উৎসবের দিন বলে মনে হল। সে মনে মনে পরম পুলকিত হয়ে বাড়ি ফিরল, ওভারকোটটা গা থেকে খুলে সন্তর্পণে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে আরও একবার নিরীক্ষণ করল সেটার পশমি কাপড় ও ভেতরের লাইনিং, তারপর ইচ্ছে করে তুলনা করে দেখার উদ্দেশে বার করল তার আগেকার সেই ঝরঝরে ফেঁসে যাওয়া আলখিল্লাটা। ওটার দিকে তাকাতে সে নিজেই হেসে ফেলল : এমনই আকাশ-পাতাল ফারাক! এরপরেও, খাবার খেতে বসে আরও অনেকক্ষণ ধরে আলখিল্লাটার শোচনীয় অবস্থার কথা মনে হতেই তার সমানে হাসি পেতে লাগল। সে ফুর্তি করে খেল, খাওয়াদাওয়ার পর আজ আর কিছু লিখল না, কোনো কাগজই না। অন্ধকার না-হওয়া পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবাবি কায়দায় আয়েশ করল। অতঃপর কালবিলম্ব না করে জামাকাপড় পরে, ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। নিমন্ত্রণকর্তা কর্মচারীটি ঠিক কোথায় বাস করত, দুর্ভাগ্যবশত আমরা বলতে পারি না : এ ব্যাপারে স্মৃতিশক্তি আমাদের সঙ্গে বড় বেশি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছে এবং সেন্ট পিটার্সবুর্গের সমস্ত রাস্তাঘাট, বাড়িঘর মাথার ভেতরে এমনভাবে মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যে সেখান থেকে সঠিক আকারে

www.pathagar.com

কোনো কিছু উদ্ধার করা বড় কঠিন। সে যাই হোক-না কেন, এটা অন্তত ঠিক যে কর্মচারীটি বাস করত শহরের এক ভদ্র পল্লীতে, যেটা অবশ্যই আকাকি আকাকিয়েভিচের বাসস্থানের খুব একটা কাছাকাছি নয়। প্রথমে আকাকি আকাকিয়েভিচকে পেরিয়ে যেতে হল স্বল্পালোকিত কতকগুলো নির্জন রাস্তা, কিন্তু কর্মচারীটির ফ্ল্যাটের যত কাছাকাছি এগিয়ে আসতে লাগল, রাস্তাঘাট ততই হতে শুরু করল উত্তরোত্তর প্রাণচঞ্চল আরও জনবহুল, অনেক বেশি আলো-ঝলমল। অনেক ঘন ঘন পথচারীদের যাতায়াত চোখে পড়ে, চমৎকার সাজগোজ পরা মহিলাদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে থাকে, পুরুষদের পোশাকের কলারে দেখা যায় বীবরের লোম, এখন ক্রমশ কদাচিৎ চোখে পড়ে পাড়াগেঁয়ে সেকরা গাড়ির গাড়োয়ানদের আর তাদের গিল্‌টি করা পেরেক বসানো ও কাঠের জাফরি কাটা স্লেজ—তার বদলে ঘন ঘন চোখে পড়ে লাল টকটকে মখমলি টুপি—মাথায় ফিটফাট চেহারার কোচমান আর ভালুকের চামড়া-বিছানো তাদের পালিশ করা চকচকে স্লেজগাড়ি, তুষারের উপর চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে পরিপাটি কোচবক্সসমেত রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে চলা জুড়িগাড়ি। আকাকি আকাকিয়েভিচ এসবই এমন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল যেন এগুলো তার কাছে সংবাদ। সে বেশ কয়েক বছর হল সন্ধ্যায় আর রাস্তায় বেরোত না। একটা দোকানের আলোকিত জানলার সামনে সে কৌতূহলী হয়ে থমকে দাঁড়াল একটা ছবি দেখার জন্য—সেখানে আঁকা ছিল সুন্দরী নারীর ছবি। মহিলা তার পায়ের জুতো খুলতে গিয়ে আগাগোড়া পা নগ্ন করে দিয়েছে, ব্যাপারটা দেখতেও নেহাৎ মন্দ নয়; এদিকে তার পেছনে অন্য ঘরের দরজা থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ঠোঁটের নিচে সুন্দর, ছোটো ছুঁচালো দাড়িওয়ালা, জুলফিধারী এক পুরুষ। আকাকি আকাকিয়েভিচ মাথা নেড়ে মৃদু হাসল, তারপর নিজের পথ ধরল আবার। সে যে হাসল তার কারণ কি এই যে সে দেখতে পেয়েছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ এমন একটি জিনিস যার সম্পর্কে সকলের মনেই কেমন যেন একটা সহজাত জ্ঞান থাকে, না কি কারণ এই যে কেরানিকুলের আরও অনেকের মতো সে-ও ভেবেছিল : 'ওঃ ওই ফরাসিগুলো! কী আর বলব, একটা কিছু যদি ধরে বসে তা হলে তার একেবারে...একেবারেই...' আবার এমনও হতে পারে যে সে হয়তো এটাও ভাবছিল না—যা-ই হোক-না কেন, মানুষের মনের ভেতরে হানা দিয়ে সে কী ভাবছে না-ভাবছে তা আর জানা সম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতে যে বাড়িতে এসিস্টেন্ট হেডক্লার্কটির ফ্ল্যাট, সেখানে সে পৌঁছুল। ভদ্রলোক বাস করেন দস্তুরমতো ঠাঁটে : সিঁড়িতে আলো জ্বলছে, ফ্ল্যাট দোতলায়। সামনের হল-এ প্রবেশ করে আকাকি আকাকিয়েভিচ দেখতে পেল মেঝের উপর সারি সারি গ্যালোশ—জুতোর পাটি। সেগুলোর মধ্যেখানে, ঘরের মাঝখানে রাখা ছিল একটা সামোভার, সামোভারটা হিসহিস শব্দে বাষ্পের কুণ্ডলী তুলছে। দেয়ালে ঝুলছিল রাজ্যের যত ওভারকোট আর ক্লোক। সেগুলোর মধ্যে কতকগুলো আবার বীবরের লোমের কলার দেওয়া, কোনো কোনোটির কলারের ভাঁজে মখমল লাগানো। দেয়ালের ওপাশ থেকে ভেসে আসছিল কোলাহল আর টুকরো টুকরো কথাবার্তার আওয়াজ—সে আওয়াজ হঠাৎ স্পষ্ট তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যখন দরজার পাল্লা খুলে যেতে খানসামা বেরিয়ে এল একটা ট্রেতে করে এঁটো গ্লাস, শূন্য ক্রিমের জগ ও খালি বিস্কুটের ঝুড়ি নিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে যে অফিস-কর্মচারীরা অনেকে আগেই জমায়েত হয়েছে এবং তারা এক প্রস্থ চা পান সেরেছে। আকাকি আকাকিয়েভিচ নিজেই নিজের ওভারকোট ঝুলিয়ে রেখে ঘরে প্রবেশ করল—সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে এক সঙ্গে খেলে গেল মোমবাতির আলো, কর্মচারীদের চেহারা, পাইপ, তাস খেলার টেবিল। চারদিক থেকে অনর্গল কথাবার্তার স্রোত এবং চেয়ার নড়ানো-চড়ানোর আওয়াজ তার কানে বিঁধে তালা ধরিয়ে দিল। সে নেহাৎই আনাড়ির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে, সন্ধানী

www.pathagar.com

দৃষ্টি বুলাল আর ভাববার চেষ্টা করতে লাগল কী করা যায়। কিন্তু ততক্ষণে সে লোকজনের নজরে পড়ে গেছে। তারা হৈচৈ করে তাকে অভ্যর্থনা জানাল আর সকলেই তৎক্ষণাৎ সামনের হলঘরে গিয়ে আবার তার ওভারকোটটা দেখল। আকাকি আকাকিয়েভিচ খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বটে কিন্তু সে খোলা মনের মানুষ ছিল বলে সকলে ওভারকোটটার যেমন প্রশংসা করছে তাতে উৎফুল্ল না-হয়ে পারল না। অতঃপর, বলাই বাহুল্য, সকলেই তাকে এবং তার ওভারকোটকেও ছেড়ে দিয়ে—সচরাচর যেমন হয়—মনোযোগ দিল হুইস্ট খেলার টেবিলের দিকে। এসবই—এই হৈ চৈ, কথাবার্তা, লোকজনের ভিড়—সবই আকাকি আকাকিয়েভিচের কাছে কেমন যেন আশ্চর্য লাগল। সে আদৌ বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত, কোথায় রাখা যায় নিজের হাত, পা ও গোটা মূর্তিটা; অবশেষে যারা তাস খেলছিল তাদের পাশে বসে পড়ে তাস খেলা দেখতে লাগল সে, তাকাতে লাগল একবার এর আরেকবার ওর মুখের দিকে, কিছুক্ষণ বাদে সে শুরু করল হাই তুলতে, অনুভব করল যে সবকিছু তার খুবই একঘেয়ে লাগছে; তাছাড়া সচরাচর যে সময় সে ঘুমোতে যায় সেই সময়ও অনেকক্ষণ হল পেরিয়ে গেছে। সে গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলে তাকে কেউ ছাড়ল না, সকলে বলল যে নতুন জিনিস কেনার সম্মানে এক গ্লাস করে শ্যাম্পেন অবশ্যই পান করা উচিত। এক ঘণ্টা বাদে খাবার পরিবেশন করা হল : খাবারের মধ্যে ছিল মেশানো স্যালাড, ঠাণ্ডা বাছুরের মাংস, মাংসের প্যাটি, পেস্ট্রি আর শ্যাম্পেন। আকাকি আকাকিয়েভিচকে ওরা জোর করে দু গ্লাস পান করাল। এরপর তার মনে হল ঘরটাতে তার বেশ ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, একবার মনে হল অনেক আগেই তার বাড়ি যাওয়া উচিত ছিল। পাছে গৃহকর্তা আবার একটা কিছু ওজর বার করে তাকে বাইরে আটকে রাখেন, এই ভয়ে চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সামনের হলঘরে খুঁজে খুঁজে বার করল তার ওভারকোট। সে বেশ কষ্ট পেল এই দেখে যে ওটা মেঝেতে পড়ে আছে। যাই হোক ওভারকোটটা ঝেড়েঝুড়ে, তার গা থেকে সমস্ত রকম ফেঁসো তুলে ফেলে দিয়ে সে ওটাকে কাঁধের উপর চড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল।

রাস্তায় তখনও আলো ছিল। তখনও খোলা ছিল কিছু কিছু খুচরো দোকানপাট—চাকরবাকর ও দারোয়ান শ্রেণীর লোকজনের স্থায়ী আড্ডার জায়গা এগুলো। অন্যগুলো বন্ধ হলে কী হবে, দরজার আগাগোড়া ফাঁক দিয়ে যে-রকম দীর্ঘ আলোর রেখা এসে পড়ছিল তাতে বোঝাই যাচ্ছিল যে সেসব এখনও সমাজপরিত্যক্ত নয় এবং সম্ভবত বড়লোকের খাস চাকরানিরা বা খানসামারা নিজেদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে মনিবদের সম্পূর্ণ ধাঁধার মধ্যে রেখে তখনও তাদের সান্ধ্য গল্পগুজব সারছে। আকাকি আকাকিয়েভিচ চলল উৎফুল্ল মেজাজে, এমনকি কেন কে জানে, হঠাৎই কোনো এক মহিলাকে সর্বাঙ্গে অস্বাভাবিক হিল্লোল খেলিয়ে বিজলির মতো পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে সে তার পিছু ধাওয়া করতে পর্যন্ত প্রবৃত্ত হল। কিন্তু যাই হোক-না কেন সে তৎক্ষণাৎ থমকে দাঁড়াল, আগের মতোই আবার চলতে লাগল মৃদু পদক্ষেপে এবং কোথা থেকে যে এই জোর কদম তার ওপর এসে ভর করেছিল তা ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। শিগগিরই তার সামনে এল সেই নির্জন রাস্তাগুলো, যেগুলো দিনের বেলায় পর্যন্ত তেমন প্রীতিকর নয়, আর সন্ধ্যাবেলায় তো কথাই নেই। এখন সেগুলো আরও নির্জন, আরো পরিত্যক্ত : ল্যাম্পপোস্টের আলোর সারি এখানে তেমন ঘন ঘন চোখে পড়ে না—বোঝাই যাচ্ছে, এখানে তেল সরবরাহের খানিকটা ঘাটতি আছে। কাঠের ঘরবাড়ি আর বেড়া শুরু হয়ে গেল; কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই; রাস্তায় একমাত্র আলোর ঝলক তুলছে তুষার, এদিকে খড়খড়ি বন্ধ করে দিয়ে নিদ্রামগ্ন নিচু কুঠুরিগুলোকে দেখাচ্ছিল শোচনীয় রকমের কালো। দেখতে দেখতে আকাকি আকাকিয়েভিচ যে জায়গাটার

www.pathagar.com

কাছাকাছি এল সেখানে রাস্তা গিয়ে মিশেছে একটা ধু ধু স্কোয়ারের সঙ্গে, তার ওপারে বাড়িঘর চোখে দেখা যায় না বললেই চলে। স্কোয়ারটা দেখাচ্ছিল ভয়ানক নির্জন।

দূরে, ঈশ্বর জানেন কোথায়, পাহারাদারের একটা গুমটির আলো দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ওটা যেন দুনিয়ার শেষ প্রান্তে আছে। এই সময় আকাকি আকাকিয়েভিচের ফুর্তি যেমন অনেকটা দমে গেল। স্কোয়ারে পা ফেলতে নিজের অজ্ঞাতেই একটা ভীতি তার ওপর এসে ভর করল, তার মন যেন খারাপ একটা কিছুর আশঙ্কায় হয়ে উঠল ব্যাকুল। সে পেছনে, এবং এপাশে-ওপাশে ফিরে তাকাল : তার চতুর্দিকে যেন অথৈ সমুদ্র। 'না, না-তাকানোই বরং ভালো', এই ভেবে সে চলল চোখ বন্ধ করে, আর যখন স্কোয়ার শেষ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য চোখ খুলল তখন হঠাৎ দেখতে পেল তার সামনে, তার প্রায় নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত চেহারার গুঁফো দুটি লোক—ঠিক কেমন, তা বোঝার সাধ্য তার ছিল না। সে চোখে সরষে ফুল দেখল, ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা।

'আরে এই ওভারকোট তো আমার!' ওদের একজন বাজখাঁই গলায় একথা বলেই খপ করে চেপে ধরল তার কলার।

আকাকি আকাকিয়েভিচ যেই সাহায্যের জন্য চেঁচাতে গেল অমনি আরেকজন তার ঠিক মুখের সামনে কেরানির মাথার সমান আকারের মুঠি বাগিয়ে গর্জন করে বলল : 'একবার চেঁচিয়ে দ্যাখ না!' আকাকি আকাকিয়েভিচ কেবল অনুভব করল ওরা ওর গা থেকে ওভারকোটটা খুলে নিল, একজন হাঁটু দিয়ে ওকে লাথি মারল, তাতে ও চিতপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে—আর কিছুই সে অনুভব করতে পারল না। কয়েক মিনিট বাদে সংবিৎ ফিরে এলে যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন কাউকেই সে দেখতে পেল না। অনুভব করল যে মাঠের মধ্যে তার ঠাণ্ডা লাগছে, ওভারকোটও নেই; সে তখন চেঁচাতে লাগল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে স্কোয়ারের শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছুনোর কোনো লক্ষণ বোঝা গেল না। হতাশ হয়ে অবিরাম চেঁচাতে চেঁচাতে সে স্কোয়ারের উপর দিয়ে ছুটতে লাগল সোজা পাহারাদারের গুমটি লক্ষ্য করে। গুমটির পাশেই টাঙ্গিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রহরার কনস্টেবলটি—কে ছাই এই লোকটি দূর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে তার দিকে ছুটে আসছে তা জানার বাসনায় সে কৌতূহলভরে তার দিকে তাকাতে লাগল। আকাকি আকাকিয়েভিচ তার কাছে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে সে পাহারায় থেকে ঘুমোচ্ছে, এদিকে যে একটা লোকের ওপর রাহাজানি হয়ে গেল সে দিকে তার কোনো দৃষ্টি নেই, চোখ নেই। কনস্টেবল উত্তর দিল যে সে ওরকম কিছুই দেখতে পায়নি, সে কেবল দেখেছিল স্কোয়ারের মাঝখানে দুটো লোক তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে; তবে ভেবেছিল ওরা বোধ হয় তার বন্ধুবান্ধব হবে; তা ছাড়া মিছিমিছি গালিগালাজ না-করে আগামীকাল পুলিশ ইনস্পেক্টরের কাছে গেলেই তো হয়—উনিই খুঁজে বার করবেন কে ওভারকোট ছিনতাই করেছে। আকাকি আকাকিয়েভিচ বাড়িতে ছুটে এল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় : তার রগের দু'পাশে এবং মাথার পেছন দিকে তখনও যে সামান্য পরিমাণ চুল অবশিষ্ট ছিল তা একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে; শরীরের দুটো পাশ, বুক আর পরনের প্যান্টালুন আগাগোড়া বরফের গুঁড়োয় মাখা। বাড়িওয়ালি বুড়ি দরজায় ভয়ঙ্কর ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, এক পায়ে চটি গলিয়ে, শালীনতাবশত গায়ের জামাটা হাত দিয়ে বুকের উপর ধরে ছুটে গেল দরজা খুলতে; কিন্তু খুলেই পিছিয়ে গেল আকাকি আকাকিয়েভিচকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে। আকাকি আকাকিয়েভিচ ব্যাপারটা খুলে বলার পর বাড়িওয়ালি গালে হাত দিয়ে বলল যে তার উচিত সোজা পুলিশ-সুপারিন্‌টেন্ডেন্টের কাছে যাওয়া। পুলিশ-ইনস্পেক্টর ফাঁকি দেবে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবে, তাকে কেবলই ঘোরাবে; তাই

www.pathagar.com

সবচেয়ে ভালো হবে সরাসরি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে যাওয়া—তাছাড়া লোকটা তার জানাও বটে, কেননা আন্না নামে যে ফিন মেয়েটি তার এখানে আগে রাঁধুনির কাজ করত সে এখন সুপারিনটেন্ডেন্টের বাড়িতে আয়ার কাজ নিয়েছে, বাড়িওয়ালি প্রায়ই স্বয়ং পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টকে তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চড়ে যেতে দেখে। তিনি প্রতি রবিবার গির্জায় যান প্রার্থনা করতে, আর সকলের দিকেই তাকান হাসিখুশি দৃষ্টিতে—সুতরাং দেখে-শুনে মনে হয় লোকটা ভালোই। এই সিদ্ধান্ত শোনার পর আকাকি আকাকিয়েভিচ বিষণ্ন মনে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল, আর কীভাবে সে সেখানে রাতটা কাটাল তা বিচার করার ভার ছেড়ে দিলাম তাদের ওপর, অন্যের অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা যাদের আছে।

খুব ভোরবেলা সে রওনা দিল পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে; কিন্তু শুনল যে সুপারিনটেন্ডেন্ট ঘুমোচ্ছেন। দশটার সময় এল, তখনও শুনল ঘুমোচ্ছেন; এগারটার সময় এল—শুনল বাড়ি নেই। সে আবার এল দুপুরের খাবারের ছুটির সময়—কিন্তু সামনের ঘরের কেরানিরা তাকে কোনো মতেই ঢুকতে দিল না, উল্টো, কী কাজে সে এসেছে, অফিসারের সঙ্গে তার কী দরকার এবং কী ঘটেছে তা অতি অবশ্য তারা জানতে চাইল। ফলে আকাকি আকাকিয়েভিচ শেষকালে জীবনে এই একবারই নিজের চরিত্রবলের পরিচয় দিল, তাদের স্রেফ বলল যে ব্যক্তিগতভাবে খোদ সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গেই তার দেখা করা দরকার, তাকে আটকানোর কোনো এক্তিয়ার তাদের নেই, সে ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে সরকারি কাজ নিয়ে, সে যখন তাদের বিরুদ্ধে অভিয়োগ করবে তখন বাছাধনরা টের পাবে। এরপর কেরানিরা আর কিছু বলার সাহস পেল না তাকে, তাদের মধ্যে একজন ডেকে আনতে গেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে। ওভারকোট ছিনতাইয়ের বৃত্তান্তটি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট যে-ভাবে গ্রহণ করলেন তা রীতিমতো অদ্ভুতই বলা যায়। কেসটার মূল পয়েন্টের ধারে-কাছে না গিয়ে তিনি আকাকি আকাকিয়েভিচকে জেরা করতে লাগলেন কেন সে এত দেরি করে বাড়ি ফিরছিল, সে কোনো আজেবাজে বাড়িতে গিয়েছিল কিনা, সেখানে ছিল কিনা। ফলে আকাকি আকাকিয়েভিচ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, তাঁর কাছ থেকে যখন সে বেরিয়ে এল তখন নিজেই বুঝতে পারছিল না ওভারকোটের কেসটার কোনো সদগতি হবে কিনা। ঐ দিন—জীবনে এই প্রথম—সারা দিন সে অফিসে অনুপস্থিত থাকল।

পরদিন সে হাজির হল আগাগোড়া পাণ্ডুর চেহারা নিয়ে, তার সেই পুরনো আলখিল্লা পরে, যেটার অবস্থা এখন আরও করুণ। ওভারকোট ছিনতাইয়ের সংবাদে অবশ্য অনেকেই মনে ব্যথা পেল, কিন্তু এমন কিছু কিছু কর্মচারীও পাওয়া গেল যারা এই সংবাদে পর্যন্তও আকাকি আকাকিয়েভিচকে নিয়ে একচোট হাসার সুযোগ ছাড়ল না। তৎক্ষণাৎ ঠিক করা হল তার জন্য চাঁদা তোলা হবে, কিন্তু যা উঠল তা যৎসামান্য। কর্মচারীদের অনেক টাকাপয়সা ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গিয়েছিল বড়সাহেবের পোর্ট্রেটের পেছনে এবং কোনো একটা বই কিনতে গিয়ে—যেটা আবার সুপারিশ করেছিলেন গ্রন্থকারের বন্ধু, তাদেরই সেকশনের কর্তা। কাজে কাজেই টাকার অঙ্ক হল নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। তাদের মধ্যে একজন সমবেদনায় বিচলিত হয়ে আকাকি আকাকিয়েভিচকে সৎপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা উচিত বিবেচনা করে বলল যে পুলিশ-ইনস্পেক্টরের কাছে গিয়ে কাজ নেই, কেননা এমনও তো হতে পারে যে পুলিশ-ইনস্পেক্টর হয়তো কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার বাসনায় কোনো না কোনো উপায়ে ওভারকোট উদ্ধার করবে, কিন্তু ওভারকোটটা যে তারই, আইনসঙ্গতভাবে তা প্রমাণ না করা গেলে ওটা থানায়ই পড়ে থাকবে; তাই সবচেয়ে ভালো হয় যদি জনৈক গণ্যমান্য

www.pathagar.com

ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া যায় যে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি উপযুক্ত জায়গায় লেখালেখি করে ও যোগাযোগ স্থাপন করে কাজটা অনেক এগিয়ে দিতে পারবেন। অগত্যা আকাকি আকাকিয়েভিচ গণ্যমান্য ব্যক্তিটির কাছে যাবে বলে ঠিক করল।

গণ্যমান্য ব্যক্তিটি ঠিক কোন পদে কাজ করতেন, তাঁর পদমর্যাদাই-বা কী, সেটা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এটুকুই শুধু জানা গেছে যে ঐ গণ্যমান্য ব্যক্তিটি গণ্যমান্য হয়েছেন হালে, এবং এর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন নগণ্য ব্যক্তি। তাছাড়া তাঁর অফিসটা অপেক্ষাকৃত গণ্যমান্য অন্যান্যদের অফিসের তুলনায় এখনও তেমন গণ্য করার মতো নয়। কিন্তু পৃথিবীতে সবসময়ই এমন লোক খুঁজে পাওয়া যায় যারা অনেকে অন্যদের চোখে নগণ্য হলেও নিজেদের গণ্যমান্যই মনে করেন। তায় আবার সেই ব্যক্তিটি আরও নানাবিধ উপায়ে তাঁর গণ্যমান্য ভাব বাড়িয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন : যেমন ধরা যাক তিনি নির্দেশ দিলেন যে তিনি যখন কাজে আসবেন তখন যেন সিঁড়ির মুখেই নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে; তাঁর কাছে সরাসরি হাজির হওয়ার দুঃসাহস যেন কারও না-হয়, সবকিছু যেন চলে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মাফিক : রেজিস্ট্রার জানাবে সেক্রেটারিকে, সেক্রেটারি নিম্নপদস্থ কেরানিকে কিংবা অন্য কোনো কর্মচারীকে, কেবল এইভাবেই কোনো বিষয় গিয়ে পৌঁছুবে তাঁর দরবারে। পুণ্য রুশভূমিতে সবকিছু অনুকরণে অনুকরণে এমনই কলুষিত হয়ে গেছে যে সবাই উঠে-পড়ে লেগেছে যার যার ওপরওলাকে নকল করতে ও ভেংচাতে। এমনকি এ-ও শোনা যাচ্ছে যে ঐ নিম্নপদস্থ কেরানি কোনো এক আলাদা ছোটোখাটো দপ্তরের পরিচালক পদে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিশন দিয়ে নিজের জন্য একটা বিশেষ ঘর বানিয়ে নিয়ে সেটাকে নাম দিয়েছেন 'হেড অফিস' আর দোরগোড়ায় লাল কলার আঁটা ও লেসের সাজগোজ পরা চাপরাসিদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—যারা তার দরজার হাতল ধরে থাকে এবং কেউ দেখা করতে এলে দরজা খুলে দেয়, যদিও 'হেড অফিসে' জোরজার করে একটা সাধারণ লেখার টেবিলের বেশি আর কিছুর স্থান সঙ্কুলান হয় না। গণ্যমান্য ব্যক্তিটির রীতিনীতি ছিল জমকালো ও গরিমান্বিত, তবে জটিল আদৌ নয়। তাঁর প্রণালীর মূল ভিত্তি হল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। 'নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা আর নিয়মানুবর্তিতা', সচরাচর তাঁর এই ছিল বুলি, আর শেষ কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে যার উদ্দেশে বলা তার দিকে সচরাচর তাকাতেন চেহারায় রীতিমতো গণ্যমান্য ভাব ফুটিয়ে তুলে। যদিও এর কোনো সঙ্গত কারণই থাকত না, যেহেতু যে ডজনখানেক কর্মচারী নিয়ে দপ্তরের পুরো সরকারি ব্যবস্থা চলত তারা অমনিতেই ভীতসন্ত্রস্ত থাকত; তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেলেই সমস্ত কাজকর্ম ফেলে সবাই সটান দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করত যতক্ষণ-না কর্মকর্তা ঘর পেরিয়ে যান। অধস্তনদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার ধরন হত সচরাচর কঠোর, তাতে প্রায়ই থাকত তিনটি বাঁধা বুলি : 'কী আস্পর্ধা! আপনি কি জানেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন? আপনার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছেন কি?' সে যাই হোক-না কেন, অন্তরের দিক থেকে তিনি কিন্তু মানুষ হিসেবে ছিলেন সদাশয়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন, তাদের উপকার করতেন; কিন্তু উঁচু পদ তাঁর মাথাটা বিলকুল ঘুরিয়ে দিয়েছিল। উঁচু পদ লাভ করার পর তিনি কেমন যেন বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, আদৌ বুঝতে পারছিলেন না কেমন আচরণ তাঁর করা উচিত। তাঁর সমপর্যায়ের কারও সঙ্গে যখন তিনি মিলতেন তখন তিনি একজন দিব্যি ভালো মানুষ, রীতিমতো ভদ্র, এমনকি বহু ক্ষেত্রে নির্বোধও তাকে বলা চলে না; কিন্তু যে মুহূর্তে নিজের এক ধাপ নিচের লোকজনের মহলে গিয়ে পড়তেন তখন তিনি হয়ে পড়তেন একেবারেই অচল; চুপচাপ থাকতেন, তাঁর অবস্থাটা হত করুণ, তিনি নিজেও বুঝতে পারতেন যে এর চেয়ে অনেক ভালোভাবে সময়টা কাটানো যায়। একেক

www.pathagar.com

সময় হয়তো তাঁর চোখে ফুটে উঠত কোনো কথাবলার উচ্ছল আকুতি বা লোকজনের দলে যোগ দেবার তীব্র বাসনা, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিত তাঁর চিন্তা: এটা কি তাঁর পক্ষে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না, এতে কি বড় বেশি গা-মাখামাখি করা হবে না, তাঁর মর্যাদা কি ক্ষুণ্ন হবে না এর ফলে?—এই সমস্ত বিচার-বিবেচনার ফলে তাঁকে চিরকাল থাকতে হত সেই একই মৌনী অবস্থায়, কেবল কদাচিৎ উচ্চারণ করতেন স্বল্পাক্ষরের দু-একটা ধ্বনি; এই উপায়ে তিনি চরম রসকষহীন হিসেবে সম্প্রতি খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই গণ্যমান্য ব্যক্তিটির কাছেই এসে হাজির হল আমাদের আকাকি আকাকিয়েভিচ, আর এসে হাজির হল নিতান্তই প্রতিকূল এক সময়ে। আকাকি আকাকিয়েভিচের পক্ষে রীতিমতো অসময় বটে এখন, কিন্তু দুঃখের বিষয় গণ্যমান্য ব্যক্তিটির পক্ষে তখন ছিল ভারি সুসময়। গণ্যমান্য ব্যক্তিটি তাঁর অফিস কামরায় বসে বসে মহা ফুর্তিতে গল্প করছিলেন সম্প্রতি রাজধানীতে আগত তার এক পুরনো পরিচিত ছেলেবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে, যার সঙ্গে কয়েক বছর তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এই সময় তাঁর কাছে খবর এল যে কোনো এক বাশ্‌মাচ্‌কিন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন : 'কে সে?' উত্তরে শুনলেন : 'কোনো এক সরকারি কর্মচারী।' 'বটে! অপেক্ষা করুক, আমার এখন সময় নেই', গণ্যমান্য ব্যক্তিটি বললেন। এখানে বলা দরকার যে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি ডাহা মিথ্যে কথা বললেন : সময় তাঁর ছিল, বন্ধুর সঙ্গে যাবতীয় আলাপ তাঁর অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ হল কথাবার্তার ক্ষান্ত হয়ে তাঁরা দু'জনে সুদীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করে আছেন, কেবল থেকে থেকে একে অন্যের ঊরুতে মৃদু চাপড় মেরে বলছেন: 'তা হলে ইভান আব্রামভিচ!' 'হুঁ, হুঁ, স্তেপান ভার্লামভিচ!' অথচ তা সত্ত্বেও তিনি কর্মচারীটিকে অপেক্ষা করতে বললেন, যেহেতু বহুকাল হল চাকরির সঙ্গে যাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, যিনি গ্রামের বাড়িতে কালাতিপাত করছেন, এমন একজন লোককে, এই বন্ধুটিকে তাঁর দেখানোর উদ্দেশ্য যে একজন সরকারি কর্মচারীকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাঁর অফিসকামরার সামনের ঘরে বসে। অবশেষে প্রাণভরে কথাবার্তা বলার পর এবং তার চেয়েও যথেষ্ট বেশি সময় চুপচাপ থেকে দিব্যি হেলান-দেওয়া আরামের চেয়ারে বসে বসে দু'জনেই যখন অনেক সিগার ধ্বংস করে ফেলছেন, তখন রিপোর্ট নিতে এসে দোরগোড়ায় কাগজ হাতে তাঁর সেক্রেটারিটি দাঁড়িয়ে পড়লে হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এভাবে তিনি তাকে বললেন : 'ও হ্যাঁ, ওখানে একজন কেরানি দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? তাকে বলুন, আসতে পারে।' আকাকি আকাকিয়েভিচের নিরীহ চেহারা আর জরাজীর্ণ ইউনিফর্ম দেখে তিনি হঠাৎ তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন : 'কী চাই আপনার?' তাঁর কণ্ঠস্বরটি কড়া, রুক্ষ। আগে থাকতেই, পদোন্নতি লাভের, অর্থাৎ বর্তমান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই নির্জনে নিজের ঘরে আয়নার সামনে বিশেষ যত্ন নিয়ে তিনি এই কণ্ঠস্বরটি রপ্ত করেছিলেন। আকাকি আকাকিয়েভিচ এদিকে ঠিক সময়মতোই যথোচিত ভয় পেয়ে বসল, খানিকটা বিভ্রান্ত অবস্থায়, যতটা তার ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে কুলোয়, (অবশ্য অন্য সময় যা করে থাকে তার চেয়েও ঘন ঘন 'মানে'-র সংমিশ্রণে, সে ব্যাখ্যা করে) বলল যে তার একটা আনকোরা নতুন ওভারকোট ছিল, তার ওপর অমানুষিক রাহাজানি হয়েছে, এখন সে তাই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে যাতে তিনি যে-করেই হোক পুলিশ কমিশনারের কাছে মানে, নয়ত অন্য কারও কাছে একটা সুপারিশ লিখে দেন, যাতে তারা ওভারকোটটা খুঁজে বার করার ব্যাপারে সাহায্য করেন। কারণ বোঝা গেল না কিন্তু কেন যেন এ ধরনের আচরণ হুজুরের কাছে অশিষ্ট বলে মনে হল।

'এসব কী ব্যাপার মশাই?' তিনি রুক্ষস্বরে বলে চললেন, 'বলতে চান, আপনি নিয়মকানুন জানেন না? আপনি কোথায় এসেছেন? কাজকর্ম কোন ধারায় চলে জানেন না?

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আপনাকে আগে দরখাস্ত দেওয়া উচিত ছিল দপ্তরে; দপ্তর থেকে সেটা যাবে হেড ক্লার্কের কাছে, তারপর সেকশনের হেডের কাছে, তারপর যাবে সেক্রেটারির কাছে, সেক্রেটারি সেটাকে শেষকালে দেবে আমার হাতে...'

'কিন্তু হুজুর', ছিঁটেফোঁটা যেটুকু মনোবল অবশিষ্ট ছিল তার সবটা প্রয়োগের চেষ্টা করতে করতে এবং সেই সঙ্গে সে যে ভয়ানক ঘেমে উঠেছে তা অনুভব করতে করতে আকাকি আকাকিয়েভিচ বলল, 'আমি হুজুর সাহস করে আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে গেলাম, কেননা, মানে...ওসব সেক্রেটারি-টেক্রেটারিদের ওপর ভরসা করা যায় না...'

'কী, কী বললেন?' গণ্যমান্য ব্যক্তিটি বললেন। 'আপনার এত সাহস হল কোত্থেকে? কোথা থেকে আপনার এমন ধারণা হল? কর্মকর্তা ওপরওলাদের বিরুদ্ধে এ কী ঔদ্ধত্য ছড়িয়েছে যুবকদের মধ্যে!'

গণ্যমান্য ব্যক্তিটি সম্ভবত খেয়ালই করেননি যে আকাকি আকাকিয়েভিচের বয়স ইতোমধ্যে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে তাকে যদি যুবক আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে সেটা নেহাৎই আপেক্ষিক অর্থে—অর্থাৎ যাদের বয়স ইতোমধ্যে সত্তর পেরিয়ে গেছে, তাদের তুলনায়।

'আপনি কি জানেন কাকে এই কথা বলছেন? বুঝতে পারছেন কি আপনার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন, বুঝতে পারছেন কি? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

এই কথাগুলো বলার সময় তিনি মেঝেতে পা ঠুকলেন এবং এত উঁচু পর্দায় গলা চড়ালেন যে আকাকি আকাকিয়েভিচের কেন, অন্য যে কারও আঁতকে ওঠার কথা।

আকাকি আকাকিয়েভিচ ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল, তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল, সে টাল খেল, কোনো মতেই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না : সেই মুহূর্তে দারোয়ানরা যদি ছুটে এসে তাকে ধরে না-ফেলত তাহলে সে হয়তো ধপ করে মেঝের উপর পড়েই যেত। তাকে যখন বাইরে বয়ে আনা হল তখন সে প্রায় অসাড়। এদিকে প্রতিক্রিয়া আশারও অতিরিক্ত হওয়ায় বেশ আত্মতৃপ্তি বোধ করলেন গণ্যমান্য ভদ্রলোক। তাঁর মুখের কথা যে মানুষের সংজ্ঞা পর্যন্ত লোপ করে দিতে পারে এই ভাবনায় সম্পূর্ণ মশগুল হয়ে তিনি আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন—তিনি এটা কীভাবে নেন জানার উদ্দেশ্যে, আর বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন যখন দেখতে পেলেন যে তাঁর বন্ধুটির অবস্থাও রীতিমতো সঙ্গিন হয়ে পড়েছে। দেখেশুনে তাঁর নিজের কেমন যেন ভয়-ভয় হতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে কীভাবে নামল, কীভাবে বেরিয়ে এল রাস্তায়—এসবের কিছুই আর আকাকি আকাকিয়েভিচের মনে ছিল না। হাত, পা কোনোটাতেই সে কোনো সাড়া পাচ্ছিল না। জীবনে কখনও কোনো জাঁদরেল কর্তার কাছ থেকে সে এমন দাবড়ানি খায়নি—তা-ও আবার অন্য অফিসের। তুষার-ঝড় তখন রাস্তায় শিস দিয়ে বয়ে চলছে, তারই মধ্যে বেসামাল হয়ে ফুটপাথ থেকে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে, মুখ হাঁ করে সে হেঁটে চলল; সেন্ট পিটার্সবুর্গীয় রীতি অনুযায়ী বাতাস চতুর্দিক থেকে, সমস্ত অলিগলি থেকে এসে তার গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে সে তার কণ্ঠনালীতে অনুভব করল প্রদাহ, বাড়িতে যখন সে পৌঁছুল তখন একটি কথাও বলার আর ক্ষমতা তার রইল না; তার গলা ফুলে গেল, সে শয্যা গ্রহণ করল। উপযুক্ত ধাতানির ফলে কখনও কখনও এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় বৈকি!

পর দিন দেখা গেল তার প্রচণ্ড জ্বর উঠেছে। সেন্ট পিটার্সবুর্গের জলবায়ুর সহৃদয় সহায়তায় রোগ আশাতিরিক্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল, আর ডাক্তার যখন এসে উপস্থিত

www.pathagar.com

হলেন তখন নাড়ি টিপে দেখার পর পুলটিসের ব্যবস্থাপত্র দেয়া ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার রইল না—তা-ও একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে রোগী চিকিৎসার উদার সহায়তা ছাড়া পড়ে না-থাকে; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দিলেন যে দেড় দিনের মধ্যে রোগী নির্ঘাত অক্কা পাবে। এরপর বাড়িওয়ালির উদ্দেশে তিনি বললেন :

'আপনি কিন্তু মা বৃথা সময় নষ্ট না-করে এই মুহূর্তে ওর জন্যে পাইন কাঠের কফিন অর্ডার দিয়ে ফেলুন, কেননা ওক কাঠের কফিন ওর পক্ষে দামে বেশি হয়ে যাবে।'

আকাকি আকাকিয়েভিচ তার সম্পর্কে উচ্চারিত এই মারাত্মক কথাগুলো শুনেছিল কিনা জানি না, আর শুনে থাকলেও সেগুলো তার ওপর কোনো বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কিনা, কিংবা নিজের এই হতভাগ্য জীবনের জন্য তার মায়া হচ্ছিল কি-না—এর কিছুই আমাদের জানা নেই, যেহেতু সেই সময় সে ছিল প্রবল জ্বর ও বিকারের ঘোরে। তার চোখের সামনে খেলে যাচ্ছিল একের পর এক দৃশ্য—একটি অন্যটির চেয়ে উদ্ভট : কখনও সে দেখতে পাচ্ছিল পেত্রোভিচকে দেখল তাকে সে ফরমাস দিচ্ছে এমন একটা ওভারকোট বানানোর জন্য যাতে আছে চোর ধরার এক রকমের ফাঁদ। এদিকে তার কেবলই মনে হচ্ছিল চোরেরা যেন আছে ঠিক তার খাটের নিচেই। এমনকি একটা চোরকে তার কম্বলের ভেতর থেকে টেনে বার করার জন্য সে থেকে থেকে ডাকাডাকি করতে লাগল বাড়িওয়ালিকে; কখনও সে জিজ্ঞেস করতে লাগল তার নতুন ওভারকোট থাকা সত্ত্বেও কেন চোখের সামনে পুরনো আলখিল্লাটা ঝুলছে, কখনও-বা তার মনে হল সে যেন সরকারি অফিসের জাঁদরেল কর্তাটির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত ধাতানি খাচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলছে : 'অপরাধ হয়ে গেছে হুজুর!' আর শেষকালে বেজায় মুখ খারাপ করে এমন সব অতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথাও উচ্চারণ করছে যা শুনে বুড়ি বাড়িওয়ালি পর্যন্ত ক্রুশচিহ্ন আঁকল—তার মুখ থেকে এ-রকম কথা সে জীবনেও শোনেনি, তায় আবার প্রতিটি শব্দ সরাসরি অনুসরণ করছিল 'হুজুর' সম্বোধন। অতঃপর সে যা বলতে শুরু করল তার পুরোটা এমনই আবোল-তাবোল যে কিছু বোঝার উপায় থাকল না। কেবল দেখা গেল সেই অশ্লীল কথা ও ভাবনার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছিল সেই একই ওভারকোট। অবশেষে বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

তার ঘর বা জিনিসপত্র কোনোটাই সিল করা হল না, যেহেতু উত্তরাধিকারী বলতে কেউ ছিল না। আর সম্পত্তি সে রেখে গিয়েছিল সামান্যই, যা ছিল তা হল একগোছা পালকের কলম, সরকারি দপ্তরখানার দিস্তাখানেক সাদা কাগজ, তিন পাটি মোজা, প্যান্টালুন থেকে খসে-পড়া দু-তিনটে বোতাম আর পাঠকবর্গের পূর্বপরিচিত সেই আলখিল্লাটি। এসব কার কপালে জুটল ঈশ্বরই জানেন : স্বীকার করতে বাধা নেই, বর্তমান কাহিনীর বিবরণদাতারও এ সম্পর্কে কোনো আগ্রহ হয়নি। আকাকি আকাকিয়েভিচের মৃতদেহ বার করে নিয়ে যাওয়া হল, দেওয়া হল কবর। সেন্ট পিটার্সবুর্গের জীবনযাত্রা চলতে লাগল আকাকি আকাকিয়েভিচকে বাদ দিয়ে—যেন ঐ নামের কোনো লোক কখনও সেখানে ছিল না। অদৃশ্য হল, অন্তর্ধান করল একটি প্রাণ, যাকে রক্ষা করার জন্য কেউ এগিয়ে এল না, যে প্রাণ কারও কাছে মূল্যবান নয়, কারও কোনো কৌতূহল জাগ্রত করে না এমনকি যে প্রকৃতিবিজ্ঞানী সাধারণ একটা মাছিকে পিনে গেঁথে তাকে অনুবীক্ষণের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণের সুযোগ ছাড়েন না, তারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না; এমনই এক প্রাণী—যে দপ্তরের কেরানিকুলের হাসিঠাট্টা মুখ বুজে সহ্য করছে, কোনো অসাধারণ কর্ম সমাপন না-করেই কবরে গেছে। সে যাই হোক-না কেন, অন্তত জীবনের অন্তিমকালের অব্যবহিত পূর্বেও তার কাছে ওভারকোটের রূপ ধরে ঘর-আলো-করা ক্ষণিকের অতিথি

www.pathagar.com

এসেছিল, ক্ষণিকের জন্য তার হতভাগ্য জীবনকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল, কিন্তু তার ওপর পরে আবার নেমে আসে দুর্ভাগ্যের দুঃসহ আঘাত, যেমন ভাবে নেমে এসেছিল পৃথিবীর অধিপতি আর রাজারাজড়াদের ওপর।... তার মৃত্যুর কয়েক দিন বাদে ডিপার্টমেন্ট থেকে তার ফ্ল্যাটে পাঠানো হল এক পেয়াদাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে যে ওপরওলার কাছ থেকে তলব এসেছে অবিলম্বে যেন সে কাজে হাজির হয়; কিন্তু পেয়াদাকে ফিরে আসতে হল কিছুই সঙ্গে না-নিয়ে, সে এসে রিপোর্ট করল যে তার আর আসার উপায় নেই। 'কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলল : 'ও মারা গেছে, তিন দিন আগে ওকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে।' এই ভাবে ডিপার্টমেন্টের লোকে আকাকি আকাকিয়েভিচের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারল, আর তার পরদিনই অফিসে তার জায়গায় বসে থাকতে দেখা গেল এক নতুন কেরানিকে, তার চেয়ে অনেক লম্বা, এ লোকটার হাতে লেখা অক্ষরগুলো তেমন সোজা সোজা ধরনের নয়, অনেক বেশি হেলানো আর তেরছা।

কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল যে এখানেই আকাকি আকাকিয়েভিচ সংক্রান্ত কাহিনীর পরিসমাপ্তি নয়, কে ভাবতে পেরেছিল যে অবহেলিত জীবনের পুরস্কার স্বরূপই হয়তো-বা মৃত্যুর পর আরও কয়েক দিন আলোড়ন সৃষ্টি করে বাঁচা তার ভাগ্যে ছিল? অথচ তা-ই ঘটল, ফলে আমাদের নিরানন্দ ঘটনাটি অপ্রত্যাশিতভাবে অলৌকিক পরিসমাপ্তি লাভ করল। সেন্ট পিটার্সবুর্গে হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে কালিন্‌কিন ব্রিজের কাছে অথবা তারও অনেকটা দূরে রাতের বেলায় এক প্রেতাত্মার আনাগোনা শুরু হয়েছে। দেখতে সে কেরানির মতো, মনে হয় যেন কোনো ওভারকোট খোয়া যাওয়ায় তা খুঁজছে আর ওভারকোট ছিনতাই হওয়ার অজুহাতে সরকারি পদমর্যাদা ও খেতাবের কোনো বাছবিচার না করে যার কাঁধ থেকে যেমন পারছে—বেড়ালের লোম, বীবরের লোম, র‍্যাকুনের, শেয়ালের ও ভালুকের লোমের ওভারকোট—অর্থাৎ লোকে নিজের চামড়া ঢাকার জন্য যত রকমের পশুলোম ও চামড়া ব্যবহারের কথা ভেবে বার করেছে, সে সমস্তই টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে। ডিপার্টমেন্টের কোনো এক কর্মচারী নিজের চোখে সেই প্রেতাত্মাটাকে দেখেছে, আর দেখামাত্রই সে চিনে ফেলেছে আকাকি আকাকিয়েভিচকে; কিন্তু এতে সে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে ছিল, ফলে ভালোমতো নিরীক্ষণ করে দেখার সুযোগ সে পায়নি—শুধু দেখতে পেয়েছিল মূর্তিটা দূর থেকে তাকে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে অনবরত ঐ মর্মে অভিযোগ আসতে লাগল যে কেবল নিম্নপদস্থ কেরানিদেরই হলেও কথা ছিল, মায় প্রিভি কাউন্সিলরদের পিঠ ও কাঁধ পর্যন্ত ওভারকোটের ওপর নৈশ হামলার ফলে ঠাণ্ডায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পুলিশ থেকে যে-কোনো উপায়ে, জীবিত বা মৃত যে-কোনো অবস্থায় প্রেতাত্মাটাকে গ্রেপ্তার করে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠোরতম শাস্তিবিধানের হুকুম জারি করা হল। এ ব্যাপারে তারা প্রায় সফলই হয়েছিল বলতে হয়। কোনো এক পাড়ার প্রহরারত কনস্টেবল কিরিউশ্‌কিন লেন-এ প্রেতাত্মাটার কলার সত্যি সত্যি চেপে ধরেছিল একেবারে অকুস্থলে, যখন সে এক কালের বাঁশি-ফোঁকা কোনো এক অবসরপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পীর মিহি পশমি সুতোর ওভারকোট ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। তার কলার চেপে ধরে সে চেঁচামেচি করে ডেকে আরও দুটি সাথীকে জুটিয়েও ফেলেছিল, তাদের হাতে ওকে ধরে রাখার ভার দিয়ে সে কেবল মিনিটখানেকের জন্য নিজের বুটের ভেতরে হাত গলিয়ে চ্যাপটা নস্যিদানিটা বার করেছিল ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া অচল নাকটাকে ক্ষণেকের জন্য চাঙ্গা করে তোলার উদ্দেশ্যে; কিন্তু নস্যিটা সম্ভবত এমন জাতের ছিল যে মড়া মানুষের পক্ষেও তার ধকল সামলানো সম্ভব নয়। কনস্টেবলটি আর-একটা আঙুল দিয়ে ডান নাকের ফুটো

www.pathagar.com

চেপে ধরে বাঁ ফুটো দিয়ে আধ মুঠো পরিমাণ নস্যি টেনেছে কি টানেনি, অমনি প্রেতাত্মাটা এমন বেদম হাঁচি মারল যে বর্ষণের তোড়ে তারা তিনজনেই চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। হাতের মুঠি তুলে চোখ রগড়াতে তাদের যে সময় লাগল ততক্ষণে প্রেতাত্মা বেমালুম উধাও। এমনভাবেই প্রেতাত্মাটা তাদের বোকা বানিয়েছে যে তারা এখন নিশ্চয় করে বলতেও পারে না যে সেটা আদৌ তাদের হাতে ধরা পড়েছিল কিনা। এরপর থেকে প্রহরারত কনস্টেবলদের মনে মড়া মানুষ সম্পর্কে এমন ভয় ধরে গেল যে জ্যান্ত মানুষ পর্যন্ত ধরতে তাদের আশঙ্কা হত, তারা কেবল দূর থেকে চেঁচিয়ে বলত : 'এই কে ওখানে? তফাত যাও!' এদিকে কালিনবিশ ব্রিজ ছাড়িয়েও কেরানি-ভূতটাকে দেখা যেতে লাগল, যত গোবেচারি মানুষের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল সে।

ও হ্যাঁ, আমরা কিন্তু বিলকুল ভুলে গেছি গণ্যমান্য ব্যক্তিটিকে, যাকে প্রায় আমাদের এই কাহিনীটির—খাঁটি সত্য কাহিনীটির—অলৌকিক গতিপরিবর্তনের কারণ বলা যেতে পারে। সর্বাগ্রে, সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে তাঁর ধাতানি খেয়ে তুলোধুনো হয়ে বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ প্রস্থান করার অনতিকাল পরেই তাঁর মনে খানিকটা যেন করুণার উদ্রেক হয়েছিল। সমবেদনা তাঁর অপরিচিত ছিল না; বহু সুকুমার বৃত্তি তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন তুলত—কিন্তু তাঁদের পদমর্যাদার কারণে সেগুলো প্রকাশের পথ পেত না। তাঁর সঙ্গে যিনি দেখা করতে এসেছিলেন সেই বন্ধুটি তাঁর অফিস-কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় পর্যন্ত মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। এরপর থেকেই তিনি প্রায় প্রতিদিনই চোখের সামনে দেখতে পেতেন পদমর্যাদা উপযোগী ধাতানিতে ভেঙে-পড়া বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচের চেহারা। আকাকি আকাকিয়েভিচের চিন্তায় তিনি এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে এক সপ্তাহ বাদে তার কাছে একজন কর্মচারী পর্যন্ত পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন, তার ব্যাপারটা কী এবং তাকে সত্যি সত্যিই কোনোভাবে সাহায্য করা সম্ভব কিনা জানার উদ্দেশ্যে; যখন তাঁর কাছে খবর এসেছিল যে জ্বরে আকাকি আকাকিয়েভিচের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে তখন তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, বিবেকের যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, সারাটা দিন তাঁর মন খারাপ হয়ে ছিল। খানিকটা আমোদ-ফুর্তি করে অপ্রীতিকর ঘটনার ছাপ মন থেকে মুছে ফেলার বাসনায় তিনি সন্ধ্যাটা কাটানোর জন্য রওনা দিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে, যাঁর বাড়িতে ভদ্রসমাজের লোকজনের সাক্ষাৎ মেলে, আর সবচেয়ে বড় কথা—সেখানে সকলেই প্রায় সমপর্যায়ের পদাধিকারী, ফলে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা যায়। তাঁর মানসিক অবস্থার ওপর এই পরিবেশের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করেছিলেন, আলাপের ব্যাপারে তাঁকে প্রীতিকর ও অমায়িক দেখা গিয়েছিল—মোট কথা সন্ধ্যাটা তাঁর খুবই ভালো কেটেছিল। নৈশভোজের সময় তিনি পান করেছিলেন গ্লাস দুয়েক শ্যাম্পেন—উৎফুল্ল ভাব সঞ্চারের পক্ষে যা একটি সুপরিচিত উপকরণ। শ্যাম্পেন তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল নানারকম জরুরি তাগিদ, বিশেষত তিনি ঠিক করেছিলেন এখনই বাড়ি না-গিয়ে যাবেন এক পরিচিতা মহিলার কাছে। মহিলাটি হলেন ক্যারোলিনা ইভানভ্না—জন্মসূত্রে সম্ভবত জার্মান, যাঁর প্রতি তিনি ছিলেন পরম বন্ধুভাবাপন্ন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি বিগতযৌবন, স্বামী হিসেবে তিনি ভালো, পরিবারে তিনি শ্রদ্ধেয় পিতা। তাঁর দুই পুত্র, একটি ইতোমধ্যেই দপ্তরে চাকরি করছে, আর আছে সুশ্রী চেহারার ষোড়শী কন্যা—নাকটা তার সামান্য বাঁকা বটে, তবে সুন্দরই বলা চলে—রোজই সে তাঁর কাছে এসে হাতে চুমো খায় আর বলে 'Bonjour, Papa'। তাঁর পত্নীটি—এখনও বেশ তরতাজা মহিলা, বিশ্রী তাঁকে আদৌ বলা যায় না—প্রথমে তাঁকে

www.pathagar.com

নিজের হাতটা বাড়িয়ে দেন চুমো খাবার জন্য, তারপর হাতটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর হাতে চুমো খান। সে যাই হোক-না কেন, গার্হস্থ্যজীবনে পারিবারিক স্নেহপ্রীতিতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য শহরের অন্য এক অংশে এক বান্ধবী থাকার ব্যাপারে তাঁর রুচিগত কোনো আপত্তি ছিল না। এই বান্ধবীটি তাঁর পত্নীর চেয়ে কোনো অংশে সুন্দরী ছিলেন না, বয়সেও ছিলেন না ছোটো; কিন্তু পৃথিবীতে কত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাই-না ঘটে, আর সে সবের বিচার করাও আমাদের কাজ নয়। সুতরাং গণ্যমান্য ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলেন, স্লেজে চেপে বসে কোচম্যানকে বলেছিলেন : 'ক্যারোলিনা ইভানভ্‌নার বাড়ি'। নিজে কিন্তু তিনি তাঁর গরম ওভারকোটটা দিব্যি জুত করে গায়ে জড়িয়ে এমন একটা প্রসন্নতা অনুভব করেছিলেন যার চেয়ে ভালো অবস্থা কোনো রুশির পক্ষে কল্পনায়ও আনা সম্ভব নয়; অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যখন লোকে নিজে কিছুই ভাবে না, ভাবনাচিন্তাগুলো আপনাআপনিই মাথায় আসতে থাকে—সেগুলোর একটি অন্যটির চেয়ে মধুর, তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য, তাদের খোঁজার জন্য কোনো কষ্ট পর্যন্ত করার দরকার হয় না। পরম তৃপ্তির বশে সহজেই একে একে তাঁর মনে পড়তে লাগল সান্ধ্য আসরে অতিবাহিত প্রতিটি আমোদের মুহূর্ত স্মৃতি, প্রতিটি শব্দ, যা ছোটোখাটো মহলটিকে হাসিতে মাতিয়ে তুলেছিল; ঐসব শব্দের অনেকগুলো তিনি আবার অর্ধস্ফুট স্বরে আওড়ালেন, আর আবিষ্কার করলেন যে সেগুলো আগেকার মতোই মজার লাগছে। তাই তিনি নিজেও যে প্রাণভরে হেসে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী! তবে থেকে থেকে তাঁর আনন্দটা মাটি করে দিচ্ছিল দমকা হাওয়া—ঈশ্বর জানেন, কোথা থেকে হঠাৎ হঠাৎ তারা বেরিয়ে আসছে, কী তার কারণ তাই-বা কে জানে?—কিন্তু তারা তাঁর মুখের উপর ঢেলা ঢেলা বরফ ছুড়ে দারুণ কেটে বসছিল, তাঁর ওভারকোটের কলার নৌকোর পালের মতো ফুলিয়ে তুলছিল, কিন্তু আচমকা কোনো এক অস্বাভাবিক শক্তিতে কলারটা তাঁর মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলছিল; ফলে সেখান থেকে বার বার নিজেকে টেনে বের করে আনার ঝঞ্ঝাট তাঁকে পোহাতে হচ্ছিল। হঠাৎ গণ্যমান্য ব্যক্তিটির মনে হল কে যেন বেশ জোরে তাঁর কলার চেপে ধরেছে। পিছু ফিরে তাকাতে তাঁর নজরে পড়ল ছোটোখাটো আকারের একটি মানুষ, তার গায়ে পুরনো জরাজীর্ণ ইউনিফর্ম। লোকটাকে আকাকি আকাকিয়েভিচ বলে চিনতে পারার পর তিনি আতঙ্কিত না-হয়ে পারলেন না। কেরানিটির মুখ বরফের মতো ফ্যাকাশে, তাকে দেখাচ্ছিল পুরোপুরি একটা মড়ার মতো। কিন্তু গণ্যমান্য ব্যক্তিটির আতঙ্ক সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন তিনি দেখতে পেলেন যে মড়ার ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেল, তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো কবরের পূতিগন্ধ, সে উচ্চারণ করল এই কথাগুলো :

'আচ্ছা! এই তো শেষকালে তোর নাগাল পেলাম! শেষ কালে আমি, মানে, তোর কলার পাকড়ানোর সুযোগ পেলাম! তোর ওভারকোটটাই তো আমার দরকার! আমার জন্যে চেষ্টা তো করলিই না, আবার ধমকানির বহরটা দেখ! এবারে নিজেরটা দে তো!'

বেচারি গণ্যমান্য ব্যক্তিটির তখন মারা যাবার দশা! অফিসে তিনি অসাধারণ মনোবলের অধিকারী—সাধারণত অধস্তনদের সামনে তো বটেই, একমাত্র তাঁর পৌরুষদীপ্ত চেহারা ও মূর্তির দিকে তাকিয়েই লোকে বলাবলি করত; 'ওঃ কী চরিত্র!'—তবু, এক্ষেত্রে তিনি শালপ্রাংশু আকৃতির অধিকারী আরও অনেকের মতোই এমন আতঙ্ক অনুভব করলেন যে তাঁর এ-ও আশঙ্কা হতে লাগল : কোনো এক কঠিন রোগের কবলে পড়ে তিনি মূর্ছা যাবেন। তিনি তাই নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চটপট কাঁধ থেকে ওভারকোটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে কোচম্যানকে চেঁচিয়ে বললেন :

'জলদি বাড়ির দিকে হাঁকাও!'

www.pathagar.com

এই ধরনের কণ্ঠস্বর সচরাচর উচ্চারিত হয় কোনো চরম মুহূর্তে, তার বাস্তব প্রতিক্রিয়াও হয়ে থাকে অনেক বেশি। তাই কণ্ঠস্বর কানে যেতেই কোচম্যান অবস্থা বুঝে দুই কাঁধের ভেতরে মাথা গুঁজে চাবুক হাঁকিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। মিনিট ছয়েকের বেশি হবে কি হবে না, গণ্যমান্য ব্যক্তিটি তাঁর বাড়ির প্রবেশপথের সামনে এসে হাজির হলেন। ক্যারোলিনা ইভানভ্‌নার কাছে যাবেন কী, তার বদলে ওভারকোটবিহীন ভয়ার্ত, পাণ্ডুর অবস্থায় তিনি ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে, টলতে টলতে কোনো রকমে গিয়ে পৌঁছুলেন নিজের কামরায়, সারাটা রাত এমন একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কাটালেন যে পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে কন্যা তাঁকে সরাসরি বলে বসল : 'তোমাকে আজ একেবারে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, বাবা।' কিন্তু বাবা চুপ করে রইলেন, কী ঘটেছিল, কোথায় গিয়েছিলেন কিংবা কোথায় যেতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি কথাও কাউকে বললেন না। এই ঘটনা তাঁর ওপর গভীর ছাপ ফেলল। এখন তিনি অধস্তনদের সঙ্গে কথাবার্তায় কদাচিৎ বলে থাকেন: 'কী আস্পর্ধা! আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি কার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছেন?' আর কথাগুলো যদি উচ্চারণ করতেনও তাহলে এখন আর ব্যাপারটা ভালোমতো না-শোনার আগে নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে এর পর থেকে কেরানি-ভূতের উপদ্রব একেবারে বন্ধ হয়ে গেল : সম্ভবত জাঁদরেল অফিসারের ওভারকোট তার কাঁধে পুরো ফিট করেছিল তাই; অন্ততপক্ষে এখন আর কারও কাছ থেকে ওভারকোট ছিনিয়ে নেবার কোনো ঘটনা কোথাও শোনা যায় না। তবে বহু সক্রিয় ও হুঁশিয়ার লোকজন কিছুতেই প্রবোধ মানতে চায় না, তাঁরা বলাবলি করেন যে শহরের দূর দূর অংশে এখনও কেরানি-ভূতকে দেখা যায়। আর ঠিকই, কলোম্‌না জেলায় প্রহরারত এক কনস্টেবল স্বচক্ষে দেখেছে একটা বাড়ির পেছন দিক থেকে প্রেতমূর্তির আবির্ভাব ঘটতে; কিন্তু কনস্টেবলটি স্বভাবতই ছিল দুর্বল—এতই দুর্বল যে একবার একটা ধাড়ি গোছের সাধারণ শুওরছানা ছুটে বেরিয়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলেছিল, আর তার ফলে যে-সমস্ত কোচম্যান আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তারা দারুণ হাসাহাসি করে উঠলে এ ধরনের বিদ্রূপের জন্য তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সে একটি করে পয়সা নস্যির জন্য আদায় করে ছাড়ে—সুতরাং দুর্বল হওয়ার ফলে সে আর প্রেতমূর্তিটাকে থামাতে ভরসা পায়নি, নেহাৎই অন্ধকারের মধ্যে তাকে অনুসরণ করে চলেছিল; এদিকে প্রেতাত্মাটাও চলতে চলতে শেষকালে হঠাৎ চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল : 'ইচ্ছেটা কী শুনি?' বলেই এমন একটা ঘুষি দেখাল যা কোনো জীবন্ত মানুষের হতে পারে না। কনস্টেবলটি বলল : 'কিছু না', বলেই সঙ্গে সঙ্গে পিঠটান দিল। তবে এই ভূতটা অনেক লম্বা, তার গোঁফজোড়া বিশাল, আর মনে হল সে যেন ওবুখোভ ব্রিজের দিকে পা বাড়িয়ে রাতের আঁধারে বেমালুম অন্তর্ধান করছে।

www.pathagar.com

পাগলের দিনলিপি

*** অক্টোবর ৩ ***

বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল আজ। আমি একটু দেরি করে উঠেছিলাম ঘুম থেকে। মাভরা যখন আমার জুতো পরিষ্কার করে ঘরে ঢুকল আমি তার কাছ থেকে কটা বাজে জানতে চাইলাম। সে যখন জানাল যে অনেকক্ষণ আগে দশটা বেজে গেছে তক্ষুনি আমি পোশাক পরার জন্যে লাফিয়ে উঠলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে কীরকম খারাপ ব্যবহার পাব এটা যদি আগে জানতাম তাহলে হয়তো আমি অফিসেই যেতাম না। কিছুকাল যাবৎ লোকটা বলে আসছে, 'তুমি সব কিছুতে এত আনাড়ি কেন? প্রায়ই তুমি পাগলের মতো কাজ কর এবং এমন কাজের খিচুড়ি পাকিয়ে তোল যে কেউ তার মাথামুণ্ডু বুঝে উঠতে পারে না। তুমি ছোট হরফে অনুচ্ছেদ শুরু কর, আর তাতে তারিখ বা প্রসঙ্গের বালাই থাকে না।' শয়তান কোথাকার! সেদিন আমাকে ডিরেক্টরের অফিসে পালকের কলম চোখা করতে দেখে ব্যাটার জ্বালা ধরেছে। কী আর বলব, ক্যাশিয়ারকে ধরে কিছু অগ্রিম টাকা নেবার উদ্দেশ্য না-থাকলে আমি অফিসেই যেতাম না। ক্যাশিয়ার লোকটাও অদ্ভুত! তার কাছ থেকে মাসের মাইনেটা অগ্রিম পেতে জীবনটাই প্রায় দিয়ে দিতে হয়। টাকাপয়সা সব শেষ হয়ে মরে গেলেও ঐ শয়তানটা কিছু দিতে চায় না। আমি শুনেছি বাড়িতে ওর নিজের পাচকই ওকে চড় মারে। দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জানে সে-কথা। আমাদের অফিসে কাজ করায় কী লাভ বুঝতেই পারছি না। বাড়িয়ে বলছি না একটুও। প্রাদেশিক অফিসে বা কোনো ভদ্র অফিসের বা সরকারি কোষাগারের ব্যাপার স্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমাদের অফিসটার কেবল আভিজাত্যের ঠাট আছে, এই যা। সত্যি বলছি, এটুকু না-থাকলে আমি অনেক আগেই চাকরি ছেড়ে দিতাম।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি আমার পুরনো ওভারকোট পরে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক নেই, শুধু কিছু বয়স্কা কৃষক রমণী, কিছু রুশ ব্যবসায়ী আর দু'একজন সংবাদবাহক। ভদ্রলোকের মধ্যে কেবল একজন কর্মচারী। আমি তাকে রাস্তার মোড়ে দেখতে পেলাম। তাকে দেখেই আমি নিজেকে বললাম : 'বন্ধু, তুমি অফিস যাচ্ছ না, একটি মেয়ের পেছনে ঘুরছ, বাজারের ভেতর মেয়েটির সাদা পা দুটো দেখে বেড়াচ্ছ। সরকারি কর্মচারীরা যে কী ধরনের জীব!' এমন সময়ে একটি গাড়ি এসে থামল। দেখলাম গাড়িটা আমাদের ডিরেক্টরের। আমি দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালাম। একজন গাড়ির দরজা খুলে ধরল। ভেতর থেকে ছোট্ট একটি পাখির মতো ডিরেক্টরের মেয়ে বেরিয়ে এল। সে এমনভাবে চোখ মেলে ডানে-বাঁয়ে তাকাল যে আমার মনে হল আমি যেন শেষ হয়ে গেলাম। সে আমায় চিনতে পারল না। আমার কোটটা অত্যন্ত পুরনো ফ্যাশানের ছিল বলে আমিও নিজেকে আড়াল করে রাখলাম।

রাস্তায় মেয়েটির ছোট কুকুরটা পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। কুকুরটাকে আমি আগে দেখেছিলাম। তার নাম সেজি। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সেজি কথা বলতে পারে। সত্যি

www.pathagar.com

আমি মাতাল নই, ঠিক ঠিক তাকে কথা বলতে দেখলাম, তার কথা শুনতে পেলাম। মানুষের মতোই সে কথা বলছিল অন্য একটি কুকুরের সঙ্গে। আমি তাজ্জব বনে গেলাম। অবশ্য খুব একটা অবাক হবার কিছু নয় এটা পরে বুঝলাম। কারণ, এরকম ঘটনা কয়েকবারই শোনা গেছে। শুনেছি ইংল্যান্ডে একটা মাছ সাঁতার কেটে উপরে উঠে এসে দুটো অদ্ভুত শব্দে কথা বলেছিল। তাছাড়া কোথায় যেন কাগজে পড়েছিলাম, দুটো গরু নাকি একটা দোকানে গিয়ে এক পাউন্ড চা চেয়েছিল। কিন্তু আমি সবচেয়ে অবাক হলাম যখন সেজিকে বলতে শুনলাম, 'ফিডেল, আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু পোলকান আমার চিঠিটা পাঠাতে পারেনি।' কথাটা বিশ্বাস না-ও হতে পারে কিন্তু এক মাসের মাইনে বাজি রেখে বলছি আমি কথাটা শুনেছি। কুকুর লিখতে পারে এটা আমি কখনও শুনিনি। একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই লিখতে জানেন। অবশ্য ব্যবসায়ী দোকানদার, এমনকি সার্কদেরও লিখতে দেখা যায়, কিন্তু তাতে দাঁড়ি-কমা থাকে না, স্টাইল বলতেও কিছু থাকে না।

আমি এ-সব দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কী, আজকাল আমি এমনিসব ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি বা শুনতে পাচ্ছি যা আগে কখনো দেখতে পাইনি বা শুনতে পাইনি। আমি ছাতা খুলে ওদের পেছনে পেছনে রওনা হলাম। আমরা গোরোখোভয় স্ট্রিট পেরিয়ে গেলাম, মেশাঙ্কায়া স্ট্রিটে বাঁক নিলাম, তারপর স্টলিনায়া স্ট্রিট পথ ধরলাম। এক সময় আমরা একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে থামলাম। মেয়েটি ছ'তলায় উঠে গেল। আমি ঠিক করলাম এখন আর বাড়িটাতে ঢুকব না। আমি বাড়িটার ঠিকানা লিখে নিলাম, ঠিক করলাম সময় পেলেই আসব।

*** অক্টোবর ৪ ***

আজ বুধবার। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিভাগীয় প্রধানের অফিসে গেলাম। তাঁর সমস্ত পালকের কলম চোখা করতে বসে গেলাম।

আমাদের ডিরেক্টর অত্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর স্থান যে কোনো সরকারি ব্যক্তির অনেক ওপরে। তিনি যে সব বই পড়েন তার সবই ফরাসি বা জার্মান ভাষায় লেখা। তিনি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একজন খাঁটি রাজকর্মচারী। আমাকে একটু বিশেষ পছন্দ করেন তিনি। শুধু তাঁর মেয়ে যদি...। যাকগে, এ নিয়ে কিছু না-বলাই ভালো। আমি 'ছোট মৌমাছি' পড়তে পড়তেই দেখলাম ১২-৩০ বেজে গেছে কিন্তু আমাদের ডিরেক্টর তখনও শোবার ঘর থেকে বেরোননি। আড়াইটার সময়ে এমন কিছু ঘটে গেল যা বর্ণনা করার মতো কলম আমার নেই। দরজা খুলে গেল। আমি ভাবলাম ডিরেক্টর এলেন। আমি কাগজপত্তর নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু ডিরেক্টর না, দেখলাম তাঁর মেয়ে সশরীরে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর তার পোশাক। সাদা পোশাকটা, রাজহাঁসের মতো। কী চমৎকার! সূর্যের আলোর মতো আমার দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'বাবা এখানে আছেন।' ওহ্ কী চমৎকার গলা! ক্যানারি, ঠিক ক্যানারি পাখি যেন। আমি যেন তাকে বললাম, 'দেবী, আমায় মেরে ফেল না। যদি তাই তোমার ইচ্ছে হয় তবে তা তোমার নিজের সুন্দর ঐ হাত দিয়েই করো।' কিন্তু আমি বোবা হয়ে গেলাম, 'না' শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলাম না তাকে। সে আমার দিকে তাকাল, তারপর বইপত্তরের দিকে, তারপরে তার হাতের রুমালটা হঠাৎ করেই নিচে ফেলে দিল। আমি মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম, কোনোরকমে নিজেকে সামলে রুমালটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কী স্বর্গীয় রুমাল! কী চমৎকার বুনন, কী অপূর্ব গন্ধ!

www.pathagar.com

রুমালের গন্ধ থেকেই বোঝা যায় সেটা কত বড় জেনারেলের মেয়ের রুমাল। সে আমায় ধন্যবাদ দিল, স্মিত হাসিতে তার মিষ্টি ঠোঁটজোড়া প্রায় খুলে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ একজন এসে খবর দিল, 'তুমি এখন বাড়ি যেতে পার, কারণ, কর্তা বেরিয়ে গেছেন।' আমি টুপিটা নিয়ে কোটটা চাপিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে রইলাম। তারপর চমৎকার একটা কবিতা নকল করলাম :

এক ঘণ্টা তোমায় দেখতে না পেলে
যেন পুরো বছরটাই চলে যায়
কী হতভাগ্য জীবন আমার
তুমি না থাকলে শুধু উদ্বেগ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস

এটা নিশ্চয়ই পুশকিনের কোনো লেখার অংশ। সন্ধেবেলা আবার ওভারকোট জড়িয়ে তার বাড়ির সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আশা ছিল সে এসে যখন গাড়িতে উঠবে তখন আমি তাকে আবার একটু দেখতে পাব। কিন্তু না, সে বেরোল না।

*** নভেম্বর ৬ ***

বিভাগীয় প্রধান ভয়ঙ্কর মেজাজে ছিলেন। আমি যেতেই ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'বলতে পার তোমার ব্যাপারটা কী।' 'কেন কিছুই না!' আমি উত্তর করলাম। 'ঠিক বলছ? ভালো করে ভেবে দেখো। তোমার চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। তোমার এখন আরেকটু বুদ্ধিসুদ্ধি হওয়া দরকার। তুমি নিজেকে কী মনে করেছ? তুমি ভাবছ আমি তোমার মতলবের কথা শুনিনি? আমি জানি তুমি ডিরেক্টরের মেয়ের পেছনে ছুটছ! নিজের দিকে ভালো করে তাকাও। তুমি কী? কিছুই না। কেউই না। নিজের জন্যেই তোমার একটি কোপেক নেই। আরশিতে ভালো করে তাকাও—বুঝতে চেষ্টা কর তোমার মতো লোক একজন জেনারেলের মেয়েকে ভাবতে পারছে কী করে!' এসব বলতে লাগল। তার এসব কথায় আমি কিছু পরোয়া করি না। সে ভাবছে সে বিভাগীয় প্রধান হয়েছে বলে সবকিছু বলতে পারে। আসলে ব্যাপারটা হল সে আমাদের ঈর্ষা করে। ব্যাটা গোল্লায় যাক। সে কী ভেবেছে? আমি কি একটা দরজি না সাধারণ লোক? আমি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইচ্ছে করলেই আমি উন্নতি করতে পারতাম। আমার মাত্র ৪২ বছর বয়স। আজকাল এই বয়স থেকেই জীবন শুরু হয়। দাঁড়াও, আমি তোমার চেয়েও উন্নতি করব। 'রুচ' থেকে অত্যাধুনিক স্টাইলের একটা কোট করাতে হবে। তখন তুমি আমার জুতো পরিষ্কার করারও যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আমার কেবল কিছু টাকার অভাব।

*** নভেম্বর ৮ ***

আজ আমি একটা থিয়েটারে গিয়েছিলাম। নাটকটা ছিল একজন রুশীয় নির্বোধকে নিয়ে। আমি হাসি থামাতে পারিনি। নাটকে কিছুটা নৃত্য-গীতেরও ব্যবস্থা ছিল, তার সঙ্গে বিশেষ করে ছিল একজন আইনজ্ঞ এবং একজন কলেজের রেজিস্ট্রার সম্পর্কে কিছু ব্যঙ্গ কবিতা। নাট্যকার সরাসরি দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতারক বলেছেন এবং তাদের ছেলেদের চরিত্রহীন করে দেখিয়েছেন। আজকাল চমৎকার সব নাটক লেখা হচ্ছে। আমি নাটক দেখতে ভালোবাসি। পকেটে একটা কোপেক থাকলেই হল। কিন্তু অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের কথাটা একবার ভাবুন! টিকিট কেটে দিলেও যাবে না। ঐ নাটকটিতে একজন অভিনেত্রী চমৎকার গান করেছিল। সে আমাকে মনে করিয়ে দিল একজনের... যাক, চুপ! আর নয়।

www.pathagar.com

*** নভেম্বর ৯ ***

সকাল ৮টায় অফিসে রওনা হলাম। অফিসে বিভাগীয় প্রধান এমন ভাব করলেন যেন তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমিও ভান করলাম, যেন আমরা পরস্পরের অপরিচিত। এক সময় আমি কিছু কাগজপত্র দেখলাম, গোছালাম। তারপর চারটের সময় বেরিয়ে পড়লাম। আসার সময় ডিরেক্টরের বাড়ির পাশ দিয়ে এলাম, মনে হল না বাড়িতে কেউ আছে। খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম, বিছানায় কাটিয়ে দিলাম সারাটা সন্ধ্যা।

*** নভেম্বর ১১ ***

আজ ডিরেক্টরের অফিসে বসে বসে ২৩টি পালকের কলম চোখা করেছি, তার চারটে তাঁর মেয়ের জন্যে। ডিরেক্টর কলম খুব ভালোবাসেন। তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর! তিনি বেশি কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর চিন্তা সবসময়েই কাজ করে যাচ্ছে। প্রায়ই আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু কথা খুঁজে পাই না। আজ বাইরে বড় ঠাণ্ডা বা গরম এরকম কিছু, মুখে আর কোনো কথা জোগায় না। আমি তাঁর বৈঠকখানা ঘরের ভেতর প্রায়ই তাকাই—কী চমৎকার অভিজাত ঘর—কিন্তু অন্য এক দরজা দিয়ে আরেক ঘরের দিকে আমার চোখ চলে যায়। সেটা তাঁর মেয়ের ঘর—চমৎকার জার ও ফুলে সজ্জিত—সারা ঘর জুড়ে তার বিচিত্র পোশাক ছড়ানো—এসব আমি দেখি, দেখতে ভালো লাগে। একবারটি তার শোবার ঘরের দিকেও চোখ ফেলি, দেখি কী বিস্ময় সেখানে আছে—যেন স্বর্গ, স্বর্গের চেয়েও বেশি। তার ঘরের পাদানির দিকে তাকাই—যার উপর সুন্দর নরম পা ফেলে সে বিছানা থেকে নেমে আসে—সুন্দর পায়ে বরফের মতো সাদা মোজা পরতে থাকে—আহ্! কী সুন্দর...

আজ ঠিক করলাম, ওদের কুকুর সেজি অপর কুকুর ফিডেলকে যে চিঠিগুলো লিখেছিল সেগুলো পেতে হবে। একবার আমি সেজিকে খুব কাছে থেকে বলেছিলাম, 'সেজি, ঐ তরুণী সম্পর্কে সবকিছু আমায় বল। আমি কাউকে বলব না।' কিন্তু চতুর কুকুরটি কিছু বলল না, যেন কিছু শুনতেই পায়নি এমনভাবে দরজার দিকে চলে গেল। কুকুরেরা মানুষের চেয়ে চালাক—এ আমি ঠিক জানি। সেজি ইচ্ছে করলেই আমাকে সব জানাতে পারত। যাকগে, কাল ঐ চিঠিগুলো আনতেই হবে।

*** নভেম্বর ১২ ***

বিকেল দুটোর সময় আমি ভার্কভের সেই ছ'তলা বাড়িতে গিয়ে বেল বাজালাম। একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?' 'তোমাদের কুকুর ফিডেলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' আমি বললাম। মেয়েটি একেবারে থ হয়ে গেল। কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আমার দিকে ছুটে এল। আমি তাকে রুখতে গেলে সে আমার নাক কামড়ে দিল। যাই হোক, আমি শেষ পর্যন্ত ঐ চিঠির বান্ডিলটা নিয়ে চলে এলাম।

আমি চিঠিগুলো ভাগ করে গুছিয়ে নিতে চাইলাম। কারণ মোমবাতির আলোয় সব চিঠি পড়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এমন সময়ে মাভ্রা আবার ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে এল। এসব নির্বোধেরা চিরকালই অসময়ে ঘর পরিষ্কার করে—এ আমি দেখেছি। অগত্যা একবার বাইরে বেরোলাম। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। কুকুরের চিঠিগুলো থেকে আমি ডিরেক্টরের সবকিছু জানতে পারব; এমনকি তাঁর গোপন জীবনও। তাঁর মেয়ের বিষয়েও কিছু জানা যাবে। সন্ধ্যা নাগাদ আমি বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

* নভেম্বর ১৩ *

আচ্ছা, এখন চিঠিগুলো পড়া যাক : 'প্রিয় ফিডেল, তোমার এই বাজে নামটা আমি পছন্দ করতে পারছি না। তোমার জন্যে একটা ভালো নাম পাওয়া গেল না? যাই হোক, তোমার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে আমি অত্যন্ত খুশি।'

চিঠি বেশ চমৎকার শুদ্ধ করলে লেখা। আবার দেখি : 'আমি মনে করি অপরের সঙ্গে ভাব, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করা এই জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার।'

আমার এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না, তবে মনে হচ্ছে কথাটা যেন কোনো জার্মান লেখা থেকে অনুবাদ।

আবার পড়ি : 'আমার কর্ত্রী মানে পাপা যাকে সোফিয়া বলে ডাকেন, আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। আমি চা এবং কফির সঙ্গে ক্রিম খাই। একটা কথা তোমাকে বলি, বড় বড় হাড় চিবুতে আমার বাজে লাগে, আমি কেবল পাখির ডানা চিবুতে ভালোবাসি। তবে আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে আটার ঢেলা...'

ধ্যাৎ, এসব আজেবাজে কথা পড়ে কী হবে। অন্য আরেক পাতা পড়া যাক :

'আমাদের বাড়ির সব কিছু জানাতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমাদের বাড়ির কর্তার কথা শোন, সোফিয়া যাকে পাপা বলে ডাকে। তিনি বড় অদ্ভুত লোক। খুব কম কথা বলেন তিনি। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে থেকে হঠাৎ করে কেবলই বলতে শুরু করলেন, 'আমি কি এটা পাব? আমি কি এটা পাব?' তারপর এক সপ্তাহ পরে খুব উল্লসিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। সারাটা সকাল য়ুনিফর্ম-পরা লোকেরা এসে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। খাবার সময়ে তিনি আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'দেখেছ সেজি, এটা কী?' বুঝলাম ওটা একটা ফিতে—কিন্তু আমি তার কোনো গন্ধ পেলাম না, চিবুতে গিয়ে নোনতা লাগল।'

আমার মনে হল, কুকুরটা বড্ড বেড়েছে, ওকে যে চাবকানো হয়নি সেটাই ওর ভাগ্যের কথা।

আচ্ছা এবার দেখা যাক সোফিয়া সম্পর্কে কী লেখা হয়েছে।

'...আমার কর্ত্রী সোফিয়া নাচের আসরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। সে বেরিয়ে যাবার পর আমি তোমাকে কিছু লেখার সুযোগ পেলাম। আমার সোফিয়া নাচের আসরে যেতে খুব ভালোবাসে। আমি সত্যি বুঝতে পারি না সেখানে এত কী আনন্দ আছে!'

আচ্ছা আরেকটা চিঠি পড়া যাক। চিঠিটা একটু বড় মনে হচ্ছে—তাতে আবার তারিখ নেই। 'আমি বসন্তের ডাকে বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমার বুক ধুকপুক করে। যেন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। দরজায় কান পেতে থাকি আমি। বাস্তবিক, আমার অনেক প্রার্থী আছে। তার মধ্যে একটি মোটা খচ্চর এক নম্বরের নির্বোধ—সে নিজেকে একটা বিরাট কিছু ভাবে। আমি তাকে একেবারেই অবহেলা করি—এমন ভাব করে থাকি যেন আমি তার দিকে একবারও তাকাইনি। আর ঐ বিরাট ভয়ঙ্কর ড্যানিশ জন্তুটা! ওটা সব সময়ে আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ওটা যদি পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে সোফিয়ার পাপার চেয়ে লম্বা দেখাবে। তার গলাটা শয়তানের মতো। আমি তারদিকে ঘেউ ঘেউ করি। কিন্তু সে মোটেই পরোয়া করে না...।'

ধ্যাৎ, এসব গোল্লায় যাক। যত্তো সব আজেবাজে কথা! আমি মানুষ, কুকুর নই! আমি আত্মার কথা চাই। মানুষের আত্মার কথা, যা আমাকে সত্যিকারের আনন্দ দেবে। আচ্ছা আরেকটা পাতা ধরা যাক,—দেখি নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা।

www.pathagar.com

"সোফিয়া একটা ছোটো টেবিলে বসে সেলাই করছিল। এমন সময়ে একটা লোক এসে বলল, 'টেপলভ'। 'ওকে ভেতরে আসতে বলো,' সোফিয়া আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আহ্ সেজি, সেজি তুই যদি একবার তাঁকে দেখতিস? একজন বড় অফিসার—তার চুল লাল, আর তার চোখ—কী চমৎকার কালো চোখ—আগুনের মতো উজ্জ্বল!'

সোফিয়া তার ঘরে ছুটে গেল। এক মিনিট পর একজন যুবক ঘরে এসে ঢুকল, তার কালো গোঁফ। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, চুল ঠিক করে নিল এবং ঘরের চারদিকে দেখতে লাগল। আমি জানালার গায়ে সেঁটে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। অল্পক্ষণ পরেই সোফিয়া ঘরে ঢুকে ঐ আগন্তুককে নমস্কার করল। তারপর ওরা কী সব আজে-বাজে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। কোনো এক ভদ্রমহিলা যিনি নাচের সময়ে ঠিকমতো পা ফেলতে পারেন না—বোবভ্ নামে কোনো এক লোক যাকে দেখতে লাগে ঠিক সারসের মতো এবং যে নাচের সময়ে প্রায় পড়েই গিয়েছিল—লিডিনা নামে এক মহিলা যে-কিনা নিজের চোখ দুটোকে নীল বলে মনে করত, অথচ তা ছিল সবুজ।" ধ্যেৎ, আজেবাজে কথা।

আরো কিছু পড়া যাক, 'এবার একজন সরকারি কর্মচারীর কথা শোনো। পাপার ঘরে তাকে একটা টেবিল দেওয়া হয়েছে। সে যে কী বিচ্ছিরি দেখতে তা যদি তুমি ভাবতে পারতে! ঠিক যেন একটা বস্তার উপরে একটা কচ্ছপ। তার নামটা বিদ্‌ঘুটে। সব সময়ে সে বসে বসে পালকের কলম চোখা করে। তার চুল দেখতে শুকনো ঘাসের মতো। পাপা চাকরবাকরদের বদলে তাকে দিয়ে খবরাখবর পাঠান।'

আমার মনে হয় নোংরা কুকুরটা এবার আমারই সম্পর্কে বলছে। কিন্তু আমার চুল শুকনো ঘাসের মতো একথা কে বলল?

'সোফিয়া তাকে দেখতে পেলে আর হাসি থামাতে পারে না।'

শয়তান কুকুরটা মিথ্যে কথা লিখেছে! এর কথাবার্তা তো অত্যন্ত খারাপ! আমি জানি কুকুরটা আমাকে ঈর্ষা করে। এর জন্যে দায়ী কে? কেন, আমাদের বিভাগীয় প্রধান! লোকটা আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং সুযোগ পেলেই আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। তবুও দেখা যাক—যাক—আরও একটা চিঠি আছে।

'প্রিয় ফিডেল, এত বড় চিঠি লেখার জন্যে আমায় ক্ষমা কর। আমি ভাবে অভিভূত হয়ে আছি। যে লেখক প্রেমকে দ্বিতীয় জীবন বলেছিলেন তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আমাদের বাড়িতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। সেই রাজকর্মচারী ভদ্রলোক প্রায়ই আসছে। তার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে সোফিয়া। শুনেছি শিগগিরি বিয়ে হতে চলেছে তাদের। পাপা ঠিক করেছেন তিনি কোনো জেনারেল বা রাজকর্মচারী বা কর্নেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন।'

নিপাত যাক! আমি আর পড়তে পারছি না... সবসময়ে কেবল অভিজাত ব্যক্তি বা উচ্চস্তরের রাজকর্মচারী। পৃথিবীর সমস্ত ভালো জিনিস তাদের হাতে চলে যায়। আমাদের মতো লোকেরা কিছু একটা সুখের ব্যাপার লাভ করার জন্যে যখনই হাত বাড়ায় ঐসব অভিজাত বা উচ্চস্তরের রাজকর্মচারীরা তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। গোল্লায় যাক! আমি এবার একজন জেনারেল হব, ঐ মেয়েটিকে জয় করার জন্যে নয়, ঐসব অভিজাত লোকেদের আমার চারদিকে হামাগুড়ি দিতে দেখার জন্যে। যখন আমি তাদের সব নরকে পাঠাব। নিপাত যাক! আমার এখন রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। ঐ মূর্খ ছোট কুকুরের চিঠিটা আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম।

www.pathagar.com

*** ডিসেম্বর ৩ ***

এ অসম্ভব! এসব আজেবাজে কথা! ঐ বিয়ে হতে পারে না। উচ্চ রাজকর্মচারী হয়েছে তো কী হল? এটা একটা খেতাব মাত্র—এটা কেউ দেখতেও পাচ্ছে না বা হাত দিয়ে স্পর্শও করতে পারছে না। একজন উচ্চ রাজ-কর্মচারীর কপালে তো আরেকটা তিন নম্বর চোখ নেই, আর তার নাকটাও সোনার নয়—আমার মতো বা সবার মতো সে-ও নাক দিয়ে কাশে না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজই করে। অনেকবার আমি এসব পার্থক্যের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমি একটা ছোটোখাটো কর্মচারী কেন? হয়তো আমি আসলে একজন কাউন্ট বা একজন জেনারেলের মতো উচ্চপদস্থ লোক এবং আমি আমাকে অনর্থক একজন ছোটোখাটো কর্মচারী মনে করছি। হয়তো আমি জানিই-না আমি কে? ইতিহাসে এরকম অনেক দেখা গেছে : একজন সাধারণ লোক হঠাৎ আবিষ্কার করল সে একজন বড় জমিদার বা এমনি কিছু। ধরো দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমি হঠাৎ যদি একজন জেনারেলের ইউনিফর্ম নিয়ে উপস্থিত হই তখন কী হবে? সেই সুন্দরী তরুণী তখন কোন সুরে গান করবে? আমি কি ইচ্ছে করলেই গভর্নর জেনারেলের মতো একজন বড় কিছু হতে পারি না?

*** ডিসেম্বর ৫ ***

সারাটা সকাল আজ কাগজ পড়ে কাটিয়ে দিলাম। স্পেনে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে। সেখানকার সিংহাসন খালি হয়েছে কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঠিক করা যাচ্ছে না। তার ফলে অত্যন্ত গণ্ডগোল চলছে। ব্যাপারটা আমাকে খুব নাড়া দিল। তারা বলছে 'ডোনা' সিংহাসন পাবে। কিন্তু সে তা পেতে পারে না, সেটা অসম্ভব। একজন রাজাই সিংহাসনে বসবে। কিন্তু তারা বলছে সেখানে কোনো রাজা নেই। কিন্তু একজন রাজা থাকতেই হবে। রাজা ছাড়া কোনো সরকার থাকতে পারে না। তাহলে রাজা নিশ্চয়ই আছে, হয়তো তিনি কোনো অদৃশ্য স্থানে লুকিয়ে আছেন।

*** ডিসেম্বর ৮ ***

আমি অফিসে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নানা কারণে গেলাম না। ঐ স্পেনের ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করতে পারছিলাম না আমি। একজন মহিলা কী করে সিংহাসনে বসতে পারেন? ওরা সেটা হতে দেবে না। প্রথমত ইংল্যান্ড এটা সহ্য করবে না। আর কী বলব, এটা সমস্ত ইউরোপীয় নীতির ওপর একটা প্রতিক্রিয়া ঘটাবে : অস্ট্রিয়ার সম্রাট, আমাদের জার,... আমি স্বীকার করছি, এই ব্যাপারগুলো আমাকে এতই বিচলিত করল যে সারাদিন আমি কোনো কিছু তেমন দিতে পারলাম না। রাত্তিরে খাবার সময়ে মাভ্‌রাও জানাল যে আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি। আসলে সত্যিই, বিভ্রান্ত অবস্থায় আমি দুটো পেয়ালা মেঝের উপর ফেলে দিয়েছিলাম, এবং সেগুলো তৎক্ষণাৎ ভেঙে গেছে। খাওয়ার পর আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু নতুন কিছু খুঁজে পেলাম না। তারপর আমি বিছানায় অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম এবং স্পেনের প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

*** এপ্রিল ৪৩/২০০০ ***

আজ বিরাট বিজয়ের দিন। স্পেনে একজন রাজা আছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাওয়া গেছে। সেই রাজা আমি নিজে। আমি আজই এটা আবিষ্কার করলাম। সত্যি কথা বলতে কী, বিদ্যুৎ-চমকের মতো ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম। আমি বুঝতে পারছি না কী করে

www.pathagar.com

আমি ভাবতে পারতাম অথবা মুহূর্তের জন্যেও কল্পনা করতে পারতাম যে আমি একজন সাধারণ কর্মচারী। এ ধরনের অদ্ভুত ধারণা আমার মাথায় আদৌ ঢুকল কী করে আমি বলতে পারছি না। যাই হোক সামনের পথ পরিষ্কার : সবকিছু দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

আমি গোড়াতেই ব্যাপারটা মাভ্রকে জানালাম। সে যখন শুনল যে তার সামনেই স্পেনের রাজা দাঁড়িয়ে আছেন ভয়ে তখন সে প্রায় মরতে বসল। মূর্খ স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই কখনো স্পেনের রাজাকে দেখেনি। যাই হোক, আমি তাকে কোনো রকমে শান্ত করলাম এবং কিছু নরম কথায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে এই নতুন অবস্থায় তার ভালোই হবে কেননা আমি তার ওপর বিরক্ত হইনি, যেহেতু সে মাঝে-মাঝে আমার জুতো পরিষ্কার করে দেয়।

কিন্তু সাধারণ নিম্নশ্রেণীর একজনের কাছ থেকে কতটা আর আশা করা যায়? জীবনের বড় বড় ব্যাপার নিয়ে তুমি এদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে না। মাভ্রার ধারণা ছিল স্পেনের সমস্ত রাজাকেই ফিলিপ ২-এর মতো দেখতে হবে, এই কারণেই সে আমার কথায় ভয় পেয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে ফিলিপ আর আমি এক নই... আজ আর অফিসে গেলাম না। অফিস গোল্লায় যাক! না, বন্ধুরা, তোমরা এখন আমায় তাগাদা দিও না।

*** মারটোবর ৮৬, দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ ***

একজন কেরানি বলছিল যে আমার এখন অফিসে যাওয়া উচিত কারণ তিন সপ্তাহ ধরে আমি অফিসে যাচ্ছি না। আমি তাই অফিসে গেলাম একটু মজা করার জন্যে। বড়বাবু ভাবলেন আমি মাথা নত করে ক্ষমা চাইব, কিন্তু আমি তার দিকে একবার ভালো করে তাকিয়েও দেখলাম না। আমি এমনভাবে টেবিলে গিয়ে বসলাম যেন সেখানে আর কেউ নেই। এইসব কেরানিদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম, 'তোমরা যদি শুধু একবার জানতে তোমাদের সঙ্গে একই অফিসে কে বসে আছে... ঈশ্বর, তোমরা কী গণ্ডগোলই-না করে উঠতে! এমন কি বড়বাবু নিজেই বারবার মাথা নত করতেন, যেমন ডিরেক্টর এলে তিনি করে থাকেন।' ওরা আমার সামনে নকল করার জন্যে কিছু কাগজ দিয়ে গেল। কিন্তু আমি একটি আঙুলও তুললাম না। কয়েক মিনিট পরে চারদিকে সবাই পাগলের মতো হুড়োহুড়ি শুরু করল। তারা বলল যে ডিরেক্টর আসছেন। অনেক কেরানি আবার সবার আগে নমস্কার করার জন্যে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল। কিন্তু আমি ঠায় বসে রইলাম। ডিরেক্টর অফিসে আসছেন বলে প্রত্যেকে জামার বোতাম লাগিয়ে নিল, কিন্তু আমি একবারও নড়লাম না। তিনি তো একটা বিভাগীয় প্রধান মাত্র, তাতে কী? আমি সবচেয়ে মজা পেলাম যখন ওরা আমাকে সই করার জন্য একটা কাগজ এগিয়ে দিল।

ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছিল আমি একজন কেরানি হিসেবে সই করব। ভালো, ওদের ভাবনা ওদের ভাবতে দাও! কিন্তু আমি সই করলাম, ফার্ডিনান্দ ৮, ঠিক কাগজটার একেবারে নিচে যেখানে ডিরেক্টর সই করেন। ভয়ে প্রত্যেকের মুখ যখন কালো হয়ে গেল আমি তখন বেশ মজা পেলাম; কিন্তু আমি হাত নেড়ে বললাম : 'অতটা আনুগত্যের দরকার নেই।' তারপর আমি হেঁটে বেরিয়ে এলাম।

আমি সোজা ডিরেক্টরের বাড়িতে চলে গেলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। দারোয়ান প্রথমে আমায় ঢুকতে দিচ্ছিল না, কিন্তু আমি তাকে কিছু বলার পর তার দুই হাত অসাড় হয়ে ঝুলে পড়ল। আমি সোজা ডিরেক্টরের মেয়ের নিজস্ব ঘরে ঢুকে পড়লাম। সে আয়নার সামনে বসে ছিল, আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠে পেছন দিকে হাঁটতে লাগল। যাক, আমি তার তাকে বললাম না যে, আমি স্পেনের রাজা। শুধু বললাম এমন সুখ তার জীবনে

www.pathagar.com

আসছে যা সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। বললাম, আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে আমরা মিলিত হব। এইটুকু বলে আমি ভাবলাম যে যথেষ্ট বলা হয়েছে। আমি চলে এলাম। কিন্তু মহিলারা যে কতটা নিপুণ হতে পারে, আর তারা সত্যিকারের কী সেটা তখনই আমার কাছে স্পষ্ট হল। মহিলারা যে কার প্রতি আসক্ত সেটা কেউ বলতে পারে না। আমিই প্রথম এ রহস্যের সমাধান করলাম : তারা শয়তানের প্রতি আসক্ত। আমি মজা করছি না, দেহতত্ত্ববিদ্‌রা যাই বলুন-না কেন, বাস্তব সত্য এটাই যে মহিলারা শয়তান ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। থিয়েটারের প্রথম সারিতে বসে যে মহিলাটি হাত নাড়ছে তাকে দেখতে পাচ্ছ তো? সে কি আসলে ঐ অভিনেতার দিকে তাকিয়ে আছে? তা নয়, আসলে সে তাকিয়ে আছে সেই শয়তানটির দিকে যে তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। শয়তান আড়ালে থেকে এখন তার দিকে আঙুল নাড়ছে! এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মহিলাটি তাকেই বিয়ে করবে।

*** তারিখ নেই। ঐ দিনটির কোনো তারিখ নেই ***

আমি নেভ্‌স্কি এভিনিউ ধরে ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগলাম। আমি যে স্পেনের রাজা সেটা কোথাও প্রকাশ করলাম না। জনতার ভিড়ের মধ্যে আমার পরিচয় দেওয়াটা আমি ঠিক হবে বলে মনে করলাম না, কারণ নিয়ম অনুযায়ী, রাজভবনেই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ করার কথা। আমি কেবলমাত্র রাজকীয় পোশাকের অভাবেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। আমি যদি শুধু একটা আলখাল্লা পেতাম! আমি দর্জির কাছে যেতে পারি, কিন্তু তারা একেবারে গর্দভ। তারা আজেবাজে কথা নিয়ে মেতে থাকে, এবং সবসময়ই কাজে অবহেলা করে। আমার নতুন য়ুনিফর্মটা আমি দু'বার মাত্র পরেছি। ঠিক করলাম সেটাকে কেটে নিজেই একটা পোশাক তৈরি করব। যাতে দর্জিরা সেটাকে নষ্ট করে না দেয় সে জন্যেই কাজটা আমি নিজেই করব ঠিক করলাম, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে গেলাম যাতে কেউ না-দেখতে পায়। দু'রকমের কাঁচি দিয়ে কাপড়টা কাটতে হল, কারণ স্টাইলটা একেবারে নতুন ধরনের।

আমি তারিখটা মনে করতে পারছি না। তার কোনো মাসও ছিল না। কী জানি ছিল কিনা তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

এখন পোশাক তৈরি। আমি যখন সেটা পরলাম মাভ্‌রা চিৎকার করে উঠল। কিন্তু আমি রাজভবনে যাব কিনা সে বিষয়ে এখনও মনস্থির করতে পারিনি। স্পেন থেকে প্রতিনিধি দল না-আসা পর্যন্ত নিজে থেকে আমার যাওয়াটা রীতিবিরুদ্ধ হবে। তাতে আমার মর্যাদা নষ্ট হবে। যাই হোক আমি এখন প্রতিটি মুহূর্ত ঐ প্রতিনিধিদলের জন্যে অপেক্ষা করছি।

***প্রথম ***

প্রতিনিধিদল আসতে এত দেরি করছে কেন, আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি। কে তাদের আসতে এমন বাধা দিচ্ছে? ফরাসি দেশ হতে পারে? হ্যাঁ, ঐ দেশটা এখন খুবই শত্রুভাবাপন্ন। আমি ডাকঘরে গিয়ে জানতে চাইলাম স্পেনের প্রতিনিধিদলের কোনো খবর আছে কিনা। কিন্তু পোস্টমাস্টারটা এত নির্বোধ যে, সে এ ব্যাপারে কোনো খবরই রাখে না। সে বলল, 'না, স্পেনের কোনো প্রতিনিধি আসেনি, কিন্তু আপনি যদি চিঠি লিখতে চান সেটা যথানিয়মে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

গোল্লায় যাক্! চিঠিপত্র হয়রানি ছাড়া কিছু নয়।

www.pathagar.com

*** মাদ্রিদ, ফেব্রুয়ারিয়া ৩০ ***

আমি এখন স্পেনে। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে যে আমি টেরই পাইনি। আজ সকালে স্পেনের প্রতিনিধিদল এসে পৌঁছয়। আমি তাদের সঙ্গে একটা গাড়িতে উঠি। আমরা এত তাড়াতাড়ি এসে পড়ি যে ব্যাপারটা আমার বড় অদ্ভুত ঠেকে। বাস্তবিক আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা স্পেনের সীমান্তে চলে আসি। তারপরে রেলওয়ে এবং জাহাজে। স্পেন একটা অদ্ভুত দেশ : প্রথমে আমি যে ঘরটায় ঢুকলাম সেখানে কতকগুলো ন্যাড়ামাথা লোককে দেখতে পেলাম। আমার অনুমান, সরকারি কর্মচারী বা সৈনিক। সেখানে হয়তো তাদের ওরকম মাথা ন্যাড়া করার রীতি আছে। কিন্তু একজন সরকারি চ্যান্সেলর আমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করল সেটা আমার কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত ঠেকল। সে আমার হাত ধরে টেনে একটা ছোট ঘরে ঢোকাল, এবং বলল : 'ঐখানে বোসো, আর যদি তুমি নিজেকে একবারও রাজা ফার্দিনান্দ বল তাহলে তোমার মুখ ভেঙে দেব।' কিন্তু আমি জানতাম ওটা আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে বলা হচ্ছে। তাই আমি ওর কথা মানলাম না। তার জন্যে চ্যান্সেলর আমার পিঠে দু'বার এমন আঘাত করল যে আমি যন্ত্রণায় প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে রাখলাম। কারণ আমি জানতাম যে-কোনো খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করার আগে এ-সব নিয়ম পালন করার ব্যবস্থা স্পেনে রয়েছে এবং ঐ নিয়ম স্পেনের সর্বত্র আজও পালন করা হয়। যাক, আমি এবার সরকারি কাজের ব্যাপারে মনোযোগ দিলাম। এটা আমি আবিষ্কার করেছি যে চায়না এবং স্পেন আসলে এক, মানে একটাই দেশ, এবং এই দুটোকে দু'খানি দেশ মনে করাটা মানুষের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তবে 'স্পেন' শব্দটা দিয়ে লেখা শুরু করো, দেখবে 'চায়না'তে এসে শেষ হয়েছে। কিন্তু এসব এখন থাক, এমন একটা ঘটনা আগামীকাল ৭টার সময়ে ঘটতে চলেছে যে ব্যাপারটা ভেবে আমি এখন অত্যন্ত বিব্রত। একটা অদ্ভুত ব্যাপার : পৃথিবী চাঁদের গায়ে নেমে পড়ছে। বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী ওয়েলিংটন এ ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন।

চাঁদ একটা অত্যন্ত লঘু এবং অসার বস্তু দিয়ে তৈরি, এই জন্যেই আমি আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এটা সবাই জানে যে চাঁদ হামবুর্গ শহরে তৈরি হয়। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই দেখে ইংরেজরা এ ব্যাপারে কিছু এখন করছে না।

একটা খোঁড়া পিপেওয়ালা চাঁদ তৈরি করে। কী দিয়ে চাঁদটা তৈরি করতে হবে তার সম্পর্কে ঐ নির্বোধটার কোনো ধারণাই নেই। চাঁদ তৈরি করার সময়ে সে ঝরঝরে সুতো এবং তিসির তেল ব্যবহার করে। এইজন্যেই পৃথিবীতে এত দুর্গন্ধ, এবং দুর্গন্ধে আমাদের নাক উড়ে গেছে। এইজন্যেই আমরা কেউ আর নিজের নাক দেখতে পাই না, কারণ সেগুলো সব চাঁদে চলে গেছে। সুতরাং পৃথিবী চাঁদের উপর গিয়ে পড়লে আমাদের সমস্ত নাক মাটিতে পিষে যাবে। এইজন্যে আমি বিব্রত হয়ে জুতোমোজা পরে কাউন্সিলের ঘরে ছুটে গেলাম। যাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলিশ যাতে পৃথিবীকে চাঁদে নামতে না-দেয় সেই ব্যাপারে হুকুম দেওয়া। কাউন্সিলের যেসব ন্যাড়ামাথা কর্মচারীরা বসেছিল তারা বেশ বুদ্ধিমান। আমি তাদের বললাম, 'ভদ্রমহোদয়গণ, চাঁদকে বাঁচান, কারণ পৃথিবী চাঁদের উপর নেমে পড়ার মতলব করছে।' আমার রাজকীয় ইচ্ছে পালন করার জন্যে প্রত্যেকে যেন দুলতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকে চাঁদে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সেই চ্যান্সেলর ঘরে ঢুকে পড়লে সবাই পালিয়ে গেল তাকে দেখে। কিন্তু আমি রাজা,—যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে

www.pathagar.com

চ্যান্সেলর তার লাঠি দিয়ে আমাকে আঘাত করল এবং আমাকে আমার ঘরে তাড়িয়ে দিয়ে গেল। এর থেকেই এটা স্পষ্ট হয় স্পেনের ঐতিহ্য কী ভয়ঙ্কর!

*** জানুয়ারি, একই বছরে ফেব্রুয়ারির পর পড়ছে ***

এই পর্যন্ত স্পেন আমার কাছে কিছুটা রহস্যময়। তাদের জাতীয় নিয়ম আর সরকারি আদব-কায়দা সত্যিই অদ্ভুত। আমি বুঝতে পারি না, সত্যিই আমি তাদের বুঝতে পারছি কি না। আজ তারা আমার মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছে। প্রতিবাদে আমি সর্বশক্তিতে চিৎকার করে উঠেছিলাম, কারণ আমি সন্ন্যাসী হতে চাই না! ওরা যখন আমার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল তখন যে আমার কী হয়েছিল তার ক্ষীণ স্মৃতি কেবল আমার মনে জাগছে। এর আগে আমি আর কখনও এ ধরনের নারকীয় কাণ্ডের মধ্যে পড়ি নি। এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম যে ওরা আমায় ধরে রাখতে পারছিল না। এই ধরনের অদ্ভুত নিয়মের অর্থ কী জানি না। এ-রকম বোকার মতো, নির্বোধের মতো নিয়মগুলো! তাদের রাজাদের মূর্খতা দেখে আমি আরও অবাক হয়ে যাই, কারণ তারা এখন পর্যন্ত এইসব নিয়ম-কানুন দূর করার চেষ্টা করেনি। যাক, এ-সব লাঞ্ছনার পর এল আমার তদন্তকারী। হাজার ভেবেও আমি বুঝতে পারছি না একজন রাজা কী করে এ-ধরনের তদন্তের আওতায় পড়তে পারেন। এর পেছনে অবশ্যই ফ্রান্সের হাত আছে। কী রকম শুয়োরের মতো কাজ! তদন্ত করতে এসে লোকটি সর্বক্ষণ আমার ওপর অত্যাচার করল; কিন্তু আমি ভালো করেই জানি, বন্ধু তুমি ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত। ইংরেজরা সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞ এবং তারা সবকিছুতে নাক গলায়। আর সমস্ত পৃথিবী জানে ইংল্যান্ড যখন নস্যি নেয় ফ্রান্স তখন হাঁচে।

*** ২৫ তারিখ ***

আজ প্রধান তদন্তকারী আমার ঘরে ঢুকল। তার পায়ের শব্দ পেয়েই আমি টেবিলের নিচে লুকিয়ে পড়লাম। আমাকে দেখতে না-পেয়ে সে আমাকে ডাকতে লাগল। প্রথমে সে চিৎকার করে ডাকল : 'পপ্‌রিশ্রিন!'—আমি। সাড়া দিলাম না। তারপর : 'ইভানভ! টিট্যুলর কাউন্সিলর! অভিজাত মানুষ!'—তখনও আমি সাড়া দিলাম না। 'অষ্টম ফার্দিনান্দ, স্পেনের রাজা!' আমি এবার মাথাটা বার করব কিনা ভাবলাম। মনে মনে বললাম, 'না, বন্ধু, তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না! আমি ভালোভাবেই জানি তুমি আমার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চাও।' সেই সময়ে সে আমাকে দেখতে পেয়ে লাঠি মেরে টেবিলের তলা থেকে বের করে আনল। কাজটা ভয়াবহ রকম যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু সব যন্ত্রণাই সহ্য করে যাচ্ছিলাম, কারণ আমি ভালোভাবেই জানতাম যে লোকটা মেশিনের মতো অসহায়ভাবে ইংরেজের আদেশ পালন করে যাচ্ছে।

*** মাস ৩৪ বছর ৩৪৯ ***

না, আমার আর সহ্য করার শক্তি নেই। ঈশ্বর, ওরা আমার কী না-করছে? আমার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিচ্ছে! ওরা আমার কথা শুনছে না, আমার কাছে আসছে না এমনকি আমাকে দেখছেও না। আমি ওদের কী করেছি? ওরা কেন আমার ওপর এভাবে অত্যাচার করছে? আমার মতো একজন দুস্থ হতভাগ্যের কাছ থেকে ওরা কী চায়? আমার যেখানে নিজের বলতে কিছুই নেই সেখানে আমি ওদের কী দিতে পারি? এই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে এবং সবকিছু

www.pathagar.com

ঘুরছে, কেবল ঘুরছে। রক্ষা করো আমায়! আমায় নিয়ে যাও! আমায় এমন একটা গাড়ি দাও যার সঙ্গে থাকবে ঘূর্ণিবায়ুর মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া! চালক, লাফিয়ে ওঠো, এবং বেল বাজিয়ে দাও! ঘোড়ারা ছুটে যাও এবং আমাকে এই পৃথিবী থেকে নিয়ে চলো! দূরে, আরও দূরে, যেখানে কিছুই দেখা যায় না, কিছুই না! যেখানে আকাশ ঘুরছে চারদিকে। দূরে একটি তারা জ্বলছে, আবছা গাছগাছালি নিয়ে বনবাদাড় সরে যাচ্ছে এবং উপরে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে, গভীর নীল কুজ্ঝটিকা কার্পেটের মতো ছড়িয়ে রয়েছে, রহস্যময় জগতে শুধু একটা গিটার বাজছে, তার একদিকে সাগর, অন্যদিকে ইটালি। এবং সেখানে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ার কৃষকদের কুঁড়েঘরগুলো। দূরে যে অস্পষ্ট নীলমতো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটাই কি আমার? ঐ কি আমার মা যিনি জানালায় বসে আছেন? মা, তোমার হতভাগ্য ছেলেকে বাঁচাও! তার যন্ত্রণাকাতর মাথায় একফোঁটা চোখের জল ফেল। দেখ, ওরা তার ওপর কী অত্যাচার চালাচ্ছে! তোমার হতভাগা শিশুটিকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরো! তার জন্যে পৃথিবীতে আর এতটুকু জায়গা নেই! ওরা তার ওপর অত্যাচার করেই চলেছে। মা, মাগো, তোমার হতভাগ্য শিশুটিকে একটুখানি করুণা করো...

এবং তুমি কি এটা জানতে যে আলজিরিয়ার সুলতানের নাকের নিচে ডান ধারে একটা আঁচিল ছিল?

www.pathagar.com

সেন্ট জন দিবসের আগের সন্ধে

ফোমা গ্রিগরিয়েভিচের বিশেষত্বই ছিল এই—এক গল্প সে মরে গেলেও দু'বার বলবে না; ধরে-পাকড়ে কেউ যদি তাকে কখনও রাজিও করাত, ফিরে বলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেত আস্ত একটা নতুন গল্প। বুড়ো হরদম তার কল্পনায় নতুন নতুন ঘটনা, নতুন নতুন চরিত্রের জাল বুনত; আর আদত গল্পটার খোলনল্‌চে এমনভাবে পাল্টে যেত যে কারো ধরবার সাধ্যি থাকত না। কিছু কিছু লোক আছে, তাদের বদঅভ্যেস হল সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক কাগজ বের করা; আজেবাজে লেখা দিয়ে কাগজের পাতা ভর্তি করবার জন্যে সবসময় তারা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। এই রকমের একজন হন্যে কাগজওলা একবার বুড়োর কাছ থেকে একটা গল্প হাতিয়েছিল। বুড়োর ছাই তা মনেও ছিল না। একদিন হঠাৎ টকটকে সবুজ কোট পরে সেই কাগজওলা ছোকরা এসে হাজির; সঙ্গে একটা চটিবই। বইটার পাতা খুলে সে আমাদের সামনে ধরল। তাতে কী লেখা আছে দেখার জন্যে ফোমা গ্রিগরিয়েভিচ চশমাটা চোখে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু চশমাটা একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছে; কাচজোড়া লাগাতে রোজই সে ভুলে যায়। চশমাটা চোখে দিতে না-পেরে বুড়ো বইটা আমার দিকে ঠেলে দিল। আমি একটু-আধটু পড়তে পারি; চশমাও আমার লাগে না। সুতরাং আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে দিলাম। সবে তিন-চার পাতা পড়েছি, এমন সময় বুড়ো আমার হাত ধরে থামিয়ে দিল।

'রও, রও! কী পড়ছ এটা?'

প্রশ্ন শুনে আমি তো থ'।

বললাম, 'সেকি, ফোমা গ্রিগরিয়েভিচ! আপনার গল্পই তো পড়ছি—ভাষাটা পর্যন্ত আপনার।'

'কে বললে আমার গল্প?'

'বলবে আবার কে? কাগজে ছেপে দিয়েছে দেখছেন না? দিফাকার জনৈক চোপদার কথিত!'

বুড়ো চোপদার রুখে উঠল, 'যে ছেপেছে তার মুখে আগুন! আমি তাকে মোটেই ও জিনিস বলিনি। বানিয়ে বলার জায়গা পায়নি কুত্তা কাঁহাকা! এইসব ছিটগ্রস্ত লোকদের নিয়ে তো মহা জ্বালা দেখছি। আসল গল্পটা তাহলে আমার থেকেই শোনো।'

আমার সবাই তাকে ঘিরে বসলাম। বুড়ো বলতে শুরু করল—

আমার এক ঠাকুর্দা ছিলেন (তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক! স্বর্গে ভালো ময়দার রুটি আর মধুতে ডোবানো পিঠে তাঁর জন্যে বরাদ্দ হোক!) আহা, অমন গল্প-বলিয়ে খুব কমই হয়। লোকে তাঁর কাছে গল্প শুনতে বসে কখনও একটু উশখুশ করত না। সারাদিন ধরে শুনলেও নয়। আজকাল যা সব গল্প-বলিয়ে হয়েছে, আর বলো না; ভজরং ভজরং করে বকে যায় ঠিক রেঢ়ো ভাটদের মতো—যেন তিন দিন পেটে দানা পড়েনি। যতসব বানানো কথা! শুনতে শুনতে কানে পোকা পড়ে যায়। সেকালে ঘুট-ঘুটে শীতের রাতে

www.pathagar.com

আমরা সব গোল হয়ে বসে আগুন পোহাতাম। আমার বুড়ো মা তখনও বেঁচে। মা চরকায় সুতো কাটতেন আর গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে পা দিয়ে দোলনায় দোল দিতেন। সে গান আজও আমার কানে লেগে আছে। জানলার শার্সিতে বরফ জমে চকচক করত আর ছোটো ঘরটা আগুনের তাতে গন্‌গনে হয়ে থাকত। আলোটা এমনভাবে দুলত যে, দেখে মনে হত ভীষণ ভয় পেয়েছে।

ঠাকুর্দা ছিলেন খুন্‌খুনে বুড়ো। বারো মাস চুল্লিটার পাশে তিনি কুঁকড়ে পড়ে থাকতেন। চরকার ঘর্ঘর শব্দ; তার মধ্যে আমরা ছেলের দল তাঁকে ঘিরে বসতাম গল্প শোনবার জন্যে। মোমবাতি গলে গলে পড়ত আর আলোটা মাঝে মাঝে চড়াক্ চড়াক্ করে উঠত। ঠাকুর্দা আমাদের বলতেন পুরনো দিনের বিচিত্র সব কাহিনী। কসাক আর পোলিস হানাদারদের গল্প; পোদগোর্ভা, পোলতোরা-কোঝুকা আর সগইদাচনির বীরত্বগাথা। তবে আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগত মজার মজার রূপকথা; দৈত্যদানো, ডাইনি-পেত্নিদের রোমাঞ্চকর গল্প। শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দিত, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠত। কখনও কখনও এমন ভয় পেয়ে যেতাম যে অন্ধকার হলেই গা ছম ছম করত আমাদের; মনে হত, কারা যেন সব চারপাশে গুট্‌গুট্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত্তিরে ঘর ছেড়ে একটু বেরোলেই মনে হত বিছানায় বুঝি ভূত ঢুকে পড়েছে। কতদিন যে বালিশের মতো পুঁটলি পাকানো নিজের জামাটাকে কুঁকড়ে-থাকা ভূত বলে মনে করেছি, তা আর কী বলব। আমার ঠাকুর্দার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, জীবনে কখনও তিনি বানিয়ে বলতেন না; তাঁর প্রত্যেকটা গল্পই সত্যি।

ঠাকুরর্দার কয়েকটি গল্প সত্যিই খুব অসাধারণ ছিল। তার মধ্যে একটি এখন আমি বলব। এক ধরনের ওপর-চালাক লোক আছে, তারা কাছারিতে কলম পেষে, দু-পাতা ছাপা আধুনিক বইও পড়তে পারে; কিন্তু তাদের হাতে শাস্ত্রের একটা সহজ পুঁথিও যদি দাও, এক অক্ষরও তাদের মাথায় ঢুকবে না। অথচ সবকিছুতেই তাদের হাসিঠাট্টা। তুমি যাই বল, তারা হেসে উড়িয়ে দেবে। দুনিয়া জুড়ে আজ একই হাল—লোকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেননা, বললে বিশ্বাস করবে না, একদিন আমি কথায় কথায় ডাইনিদের সম্বন্ধে বলছিলাম—একজন গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক উঠে স্পষ্ট মুখের ওপর বলল কিনা ডাইনি আছে সে বিশ্বাস করে না! এখানে আমার কম দিন হল না; ঢের ঢের পাষণ্ড দেখেছি। পাদ্রির কাছে মিথ্যে কথা বলা যেন তাদের কাছে ডালভাত। অথচ ডাইনির হাত এড়াবার জন্যে তেমন তেমন লোকদের মুখেও আমি রামনাম শুনেছি। কিন্তু কী অবস্থাই-যে হত যদি ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারত—কী, তা আর বলে কাজ নেই!

ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, অনেক অনেক দিন আগে—আমাদের এ গ্রামের তখন এ চেহারা ছিল না। গ্রাম বলতে তখন মাঠের এদিক-ওদিক ছড়ানো বারো-চোদ্দ ঘর লোকের ছোট্ট একটা বসতি। ছিটেবেড়ার দেয়াল, মাথার উপরটা যেমন-তেমন করে ছাওয়া। উঠোনে বেড়া, বাগান, গোলা—এ সবের বালাই ছিল না। তা-ও অমন কুঁড়েঘরে তারাই শুধু থাকত, যাদের অবস্থা ভালো। আমাদের মতো দীনদরিদ্র লোকেরা থাকত মাটিতে গর্ত খুঁড়ে। খোঁদলই ছিল আমাদের ঘরবাড়ি। উনুনের ধোঁয়া দেখে শুধু বোঝা যেত ওগুলোতে থাকে কেষ্ট'র জীব। ওভাবে যে লোকে থাকত, তার কারণ এ নয় যে তারা খুব গরিব ছিল—সে সময়ে প্রায় প্রত্যেকেই ছিল কসাক এবং তারা অন্যান্য জায়গা থেকে প্রচুর ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আসত—আসলে তখন ভালো ঘর তোলার কোনো মানেই হত না। ক্রিমিয়া, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া থেকে নানা রাজ্যের লোক তখন দেশময় হামলা করে

www.pathagar.com

বেড়াত। কখনও কখনও দেশোয়ালি ভাইরাও দল পাকিয়ে এসে আমাদের যথাসর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেত। সে সময়ে হত না-এমন জিনিস নেই।

একজন লোককে সে সময়ে প্রায়ই পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। লোক তো নয়, যেন মূর্তিমান এক পিশাচ। সে থাকে কোন চুলোয়, আসেই-বা কেন কেউ জানত না। মদ খায়, হুল্লোড় করে, তারপর কোথায় যে সে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কেউ আর তার পাত্তা পায় না। তারপর আবার হঠাৎ একদিন গাঁয়ের রাস্তায় তাকে উদয় হতে দেখা যায়। রাস্তাটা ছিল দিকাঙ্কার গির্জা থেকে একশ হাত দূরে। এখন আর সে-রাস্তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাস্তার কসাকদের জুটিয়ে নাচ-গাচ-হল্লা জুড়ে দিত, দু'হাতে পয়সা ওড়াত আর শ্রাদ্ধ করত ভোদকার। কখনও কখনও মেয়েরাও তার খপ্পরে পড়ত; গাদা-গাদা চুলের ফিতে, কানের দুল, গলার হার জোর করে তাদের যে গছিয়ে দিতে চাইত। মেয়েরা তার হাত থেকে কোনো উপহার চট্ করে নিতে চাইত না। কে জানে জিনিসগুলো ভূতপেত্নিদের কিনা? এখন যেখানে ওপোশনিয়া রোড, সেখানে আমার নিজের ঠাকুর্দার পিসিমার একটা সরাইখানা ছিল। সেই সরাইখানায় বাসাভ্রিয়ুক (ওটা সেই নররূপী পিশাচটার নাম) প্রায়ই স্ফূর্তি করতে আসত। ঠাকুর্দার সেই পিসি বলতেন, 'হাজার সাধলে ও-লোকটার বিলোনো কোনো জিনিস আমি ছোঁব না।' কিন্তু ও দিলে 'না' বলে কার সাধ্যি? খোঁচা-খোঁচা ভুরু কুঁচকে এমনভাবে সে তাকাত যে অতি বড় সাহসী পুরুষেরও অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হবার দাখিল হত। ওর দেওয়া জিনিস নেওয়াও ছিল এক জ্বালা। নিলে সেই রাত্তিরেই জলা থেকে উঠে আসত ওর এক শিং-ওলা সাগরেদ; গলায় হার থাকলে গলা টিপে ধরত, আঙুলে আংটি থাকলে আঙুল কামড়ে ধরত, চুলে ফিতে বাঁধা থাকলে চুলের মুঠি ধরে টান লাগাত। ওর ভালো জিনিসের কপালে আগুন। জিনিসগুলো ছাড়ালেও ছাড়ে না, এমনি মুস্কিল। জলে ফেলে দাও, হারই হোক, আংটিই হোক ভেসে উঠে আবার ঠিক তোমার কাছে ফিরে আসবে।

গ্রামে এক গির্জা ছিল। যতদূর মনে পড়ে, সেন্ট পেন্তেলেইয়ের গির্জা। সে সময়ে ফাদার আফানাসি তার পাদ্রি ছিলেন। এমনকি ইস্টারের পরবেও বাসাভ্রিয়ুককে গির্জায় আসতে না-দেখে তিনি তাকে খুব বকাবকি করে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালার ভয় দেখালেন, তাতে তার ভারি বয়েই গেল। এমনিতেই সে ন্যাড়া। উল্টে খুব ক্যাঁট ক্যাঁট করে সে শুনিয়ে দিল : 'আরে মশাই, নিজের পাঁঠার মতো গলা—শেষটায় গরম হালুয়া দিয়ে আটকে দেব, সেটা কি ভালো হবে?' এ পাপিষ্ঠের কী উপায় হবে? ফাদার আফানাসি বিধান দিলেন, কাউকে যদি বাসাভ্রিয়ুকের সঙ্গে মাখামাখি করতে দেখা যায়,তা হলে সে হবে বিধর্মী—খ্রিস্টীয় গির্জার শত্রু, গোটা মানব জাতের দুশমন।

ঐ গ্রামেই থাকত এক কসাক, তার নাম কোর্ঝ। তার বাড়িতে একজন কিষান ছিল, লোকে তাকে অনাথ পেত্রো বলে জানত—সম্ভবত কে তার বাবা, কে তার মা কারও মনে ছিল না বলে। গির্জার দারোয়ান বলত, পেত্রো যখন এক বছরের তখন তার মা-বাবা প্লেগ হয়ে মারা যায়। আমার ঠাকুর্দার পিসি কিন্তু সে কথা কানে না তুলে তার নানারকম সম্বন্ধ টেনে বার করতেন। পেত্রো ওসব কেয়ার করত না। পিসি বলতেন, পেত্রোর বাবা থাকে জাপোরোজিয়েতে; ভুরুকরা তাকে বন্দি করে নিয়ে কী অত্যাচারটাই-না করেছিল। শেষ পর্যন্ত খোঁজা সেজে কী করে যে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পেত্রোর বাবা পালিয়ে আসে, সে এক কাণ্ড। বাচ্চাই হোক, ধাড়িই হোক, কালো ভুরু যে মেয়েদের তারা পেত্রোর কুলশীল নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাত না। পেত্রোর যদি পরনে থাকত আঙরাখা, মাথায় নীল ঝুঁটিদার আস্ত্রাখান টুপি, কোমরে লাল টকটকে কটিবন্ধ, পাশে ঝোলানো

www.pathagar.com

থাকত তুর্কি তলোয়ার, এক হাতে চাবুক আর অন্য হাতে বাঁশি—তাহলে পেত্রোর কাছে গাঁয়ের কোনো ছেলেকে আর দাঁড়াতে হত না। মেয়েরা একবাক্যে এই কথাই বলত। পেত্রোর একটিমাত্র ছাইরঙের আঁট জামা; ইহুদিদের পকেটে যত-না টাকা, তাতে তার চেয়েও বেশি ফুটো। ওটা তেমন বড় কথা নয়; তার চেয়েও বড় কথা, বুড়ো কোর্ঝ-এর এক অপরূপ রূপসী কন্যা ছিল! সে যে কী সুন্দর, তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। আমার ঠাকুর্দার পিসি বলতেন—মেয়েদের জানোই তো, কিছু মনে করো না, শয়তানের গালে চুমো খেতে হয় সে-ও ভি আচ্ছা তবু তারা কোনও মেয়েকে সুন্দরী বলবে না—পিসি বলতেন, মেয়েটার গোলাপি গাল দুটো ভোরবেলাকার শিশির-ধোয়া সদ্যফোটা আফিমের ফুলের মতো চকচক করত। শহুরে ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে আজকাল মেয়েরা ক্রুশ ঝোলাবার কিংবা পয়সা রাখবার জন্যে যে রকম কালো কার কেনে, কোর্ঝ-এর মেয়ের ছিল হুবহু সেই রকমের নিখুঁতভাবে বাঁকানো ভুরু; দেখে মনে হত যেন ভুরু দুটো তার টলটলে চোখের দিকে অপলকে চেয়ে আছে। ছেলেছোকরার দল তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত, দেখে মনে হত যেন কোকিলের মতো সুধাবর্ষণ করবার জন্যেই অমন বিম্বাধরের সৃষ্টি হয়েছে। কাকের ডানার মতো কালো থোলো থোলো নরম এলো চুল তার বুকের জরিদার আঁট জামার উপর এসে পড়ত (সেকালে রংচঙে ফিতে দিয়ে মেয়েদের চুল বাঁধার রেওয়াজ ছিল না)। তিন কাল গিয়ে আজ আমার এককালে ঠেকেছে, না চাইলেও ঘাড়ের ওপর বুড়ি বউ—তবু হলফ করে বলতে পারি, আজও আমি সে মেয়েকে সামনে পেলে চুমো খেতে পারতাম।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে কাছাকাছি থাকলে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হল। সূর্য উঠবার আগেই ছোট্ট লাল জুতোর ছাপ দেখে ধরা যেত পিদর্কা তার পেত্রোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। তাতেও কোনোদিন কোর্ঝ-এর মনে খারাপ কোনোরকম সন্দেহ হয়নি। কিন্তু পেত্রোর ঘাড়ে নিশ্চয়ই ভূত চেপেছিল, নইলে হঠাৎ একদিন সে হাঁদার মতো পাশের ঘরে মেয়েটার গোলাপি গালে তীব্র আবেগে চকাস্ করে চুমোই-বা খেতে যাবে কেন। সেই একই ভূত ঠিক সেই সময় বুড়ো কোঝকে দিয়ে ঘরের দরজা খুলিয়েছিল। স্তম্ভিত হয়ে কোর্ঝ দরজা ধরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল। চুমো খাওয়ার অলক্ষুণে শব্দে বুড়ো কেমন যেন ধন্ধ মেরে গিয়েছিল। গাদা বন্দুক আর গুলি-বারুদের অভাবে লোকে সেকালে ভূত তাড়াবার জন্যে হামানদিস্তায় বাড়ি মেরে আওয়াজ করত; বুড়োর কাছে চুমো খাওয়ার শব্দটা তার চেয়েও বেশি জোরে বলে মনে হল।

নিজেকে সামলে নেবার পর কোর্ঝ তার ঠাকুর্দার আমলের ঘোড়ার চাবুকটা পেড়ে নিয়ে বেচারা পেত্রোর পিঠে ভাঙতে যাবে, ঠিক সেই সময় পিদর্কার ছ'বছরের ভাই ইভাস হঠাৎ ছুটে এসে ভয়ে বাবার পা জড়িয়ে ধরে আবদার জানাতে লাগল। 'পেত্রোকে মেরো না, বাবা!'

এরপর আর মারে কী ক'রে! হাজার হোক বাপের মন তো। পাথর তো নয়। দেয়ালে চাবুকটা যথাস্থানে টাঙিয়ে রেখে কোর্ঝ চুপচাপ পেত্রোকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। 'ফের যদি তোমাকে এ বাড়ির ছায়া মাড়াতে দেখি, তাহলে তোমার কাঁচা গোঁফ টেনে উপড়ে ফেলব, তোমার দু'ফেরতা কান-ঢাকা চুলের একটিও আস্ত থাকবে না, বলে দিলাম। এ যদি না-করেছি তো আমার নাম তেরেন্তি কোর্ঝ নয়।'

বলে কোর্ঝ তার ঘাড়ে আস্তে একটা রদ্দা মারল। তার একটা রদ্দাতেই পেত্রো ঘুরে পড়ে চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগল। তার চুমো খাওয়ার এই হল হাতে হাতে ফল।

কপোত-কপোতীর দুঃখের অবধি রইল না। এদিকে গ্রামে রটে গেল, কোর্ঝ-এর বাড়িতে কে একজন নতুন লোক ঘন ঘন আসছে, লোকটা জাতে পোল, সর্বাঙ্গে সোনালি

www.pathagar.com

জরি, গোঁফ আছে, কোমরে তলোয়ার, পায়ে কাঁটামারা জুতো, গির্জার ঘণ্টাবাদক তারাস যেমন তলিতে রাখা ঘণ্টি ঠুনঠুন করতে করতে যায় তেমনি ও-লোকটার পকেটও সব সময় ঝন্-ঝন্-ঝন্-ঝন্ করে। যার মেয়ের কালো ভুরু, তার বাড়িতে লোকে কেন যায় আমরা সবাই বুঝি। পিদর্কাও ব্যাপার বুঝতে পেরে কেঁদে দু'চোখ ভাসিয়ে ছোটো ভাইকে বুকের মধ্যে ধরে বলল, 'ইভাস, মানিক আমার, পেত্রোর কাছে একবারটি তীরের মতো ছুটে যা—সোনামানিক আমার, গিয়ে তাকে বলবি : তার কটা-কটা চোখ আমার কী ভালো-যে লাগে, তার সুন্দর মুখে আমি মুখ রাখতে চাই—কিন্তু আমার কপালে নেই। আমার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। মনে আমার সুখ নেই। নিজের বাপ আমার শত্তুর হল; অখদ্যে পোলটার সঙ্গে বাবা আমাকে জোর করে বিয়ে দেবে। পেত্রোকে বলবি : ওরা আমার বিয়ের জোগাড়যন্ত্র করছে করুক, তবে এ বিয়েতে বাজনা বাজাতে হচ্ছে না—রোশনচৌকির বদলে পাদ্রিরা মন্ত্র বলবে। বরের সঙ্গে আমি পায়ে হেঁটে নাচতে যাব না। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ওদের কাঁধ দিতে হবে। আমার ঠাঁই হবে অন্ধকারে, ঘর হবে মেপল্ কাঠের; চিমনির বদলে মাথা তুলে থাকবে ক্রুশচিহ্ন।'

ছোট্ট অবোধ ছেলেটা যখন আধো-আধো গলায় কথাগুলো বলছিল, পেত্রো কাঠ হয়ে শুনছিল।

'আমি হতচ্ছাড়া কিনা ভাবছিলাম ক্রিমিয়া কিংবা তুরস্কে যাব, সেখান থেকে লড়াইয়ের সোনাদানা নিয়ে, সুন্দরী আমার, তোমার কাছে ফিরব। চুলোয় যাক এখন ওসব, আমাদের ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। আমিও প্রিয়তমা, এক বিয়ের বাসরের জন্যে তৈরি। আমার সে বিয়ের বাসরে পাদ্রি থাকবে না—পুরুতের বদলে এক কালো দাঁড়কাক আমার মাথার উপর গাঁক গাঁক করে চেঁচাবে; খোলা মাঠ হবে আমার ঘর, পিঙ্গল ঝড়ো মেঘ হবে আমার মাথা গুঁজবার ছাদ; আমার কটা চোখ শিকারি বাজ নখ দিয়ে খাবলে নেবে; আমার কসাক শরীরের হাড়গুলো বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে, ঘূর্ণি হাওয়ায় শুকোবে। কিন্তু এসব আমি কী বলছি। কার কাছে, কার বিরুদ্ধে আমার নালিশ? এ তো দেখছি বিধিরই বিধান! যদি মরতেই হয় হাসিমুখে মরব।' এই বলে পেত্রো সোজা সরাইখানায় গিয়ে হাজির হল।

সকালে ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে নৈষ্ঠিক খ্রিস্টান হিসেবে যখন প্রার্থনা জানাবার কথা, সেই সময় পেত্রোকে সরাইখানায় ঢুকতে দেখে আমার ঠাকুর্দার পিসিমা তো অবাক। পেত্রো পুরো এক ভাঁড়, প্রায় আধ কেঁড়ে ভোদ্‌কা নিল। পিসিমা হাঁ করে চেয়ে রইল। কিন্তু তাতেও পেত্রোর দুঃখের উপশম হল না। নিমনিসন্দির চেয়েও তেতো ভোদ্‌কা যেন বিছুটির মতো তার জিভে হুল ফুটিয়ে দিল। ভোদ্‌কার ভাঁড়টা মাটিতে সে আছড়ে মারল।

হঠাৎ পেছনে কে যেন ভারী গলায় বলে উঠল, 'দুঃখ ভুলে যাও, কসাক ভায়া!'

পেত্রো ঘাড় ফেরাতেই দেখে বাসাভ্রিয়ুক দাঁড়িয়ে। বাপরে বাপ, কী কদাকার দেখতে! চুল তো নয়, যেন খোঁচা খোঁচা শুয়োরের লোম! চোখ দুটো ষাঁড়ের মতো।

'তোমার কী দরকার আমি জানি। এই জিনিসটা—' বলে সে তার কোমরে ঝোলানো চামড়ার থলিটা ঠুন্‌ঠুন্ করে নাড়াতে লাগল।

চম্‌কে উঠল পেত্রো।

'আহা, দেখলে চোখ জুড়োয়!' বলে একটা পৈশাচিক হাসি হেসে হাতের চেটোয় সোনার মোহরগুলো ঝনাৎ ঝনাৎ করে সে ঢালতে লাগল। 'কী মিষ্টি আওয়াজ! যদি এক কাজ করো, অমন ঘড়া ঘড়া মোহর তোমার হবে।'

www.pathagar.com

পেত্রো আঁকুপাঁকু করে বলে উঠল, 'শয়তান, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।' দু'জনের মধ্যে কথা পাকা হল।

'দেখ পেত্রো, তুমি একেবারে ঠিকসময়ে এসে গেছ। কাল সকালে সেন্ট জনের পরব। আজ রাত্তিরে আকাশলতায় ফুল ধরবে—বছরে এই একটা দিনই ফুল হয়। দেখো, এ সুযোগ যেন হেলায় হারিও না। আজ মাঝরাতে আমি তোমার জন্যে ভালুকডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি এসো।'

মুর্গির ছানারা যেমন কাতর হয়ে প্রতীক্ষা করে কখন মা তাদের জন্যে কুঁড়ো নিয়ে আসবে, পেত্রো সারাদিন তার চেয়েও বেশি অধীর হয়ে কাটাল। গাছের দিকে মুহুর্মুহু সে চেয়ে চেয়ে দেখে ছায়া দীর্ঘ হল কিনা, কতক্ষণে লাল টুকটুকে হয়ে সূর্য অস্ত যায়। যতই প্রহরের পর প্রহর কাটে, ততই পেত্রোর ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যেতে থাকে। মনে হয় ঈশ্বর যেন দিনটার খেই হারিয়ে ফেলেছেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য পাটে গেল। আকাশের এককোণে লেগে থাকল শুধু লাল একটা ফালি। আস্তে আস্তে লাল রংটুকুও মুছে যেতে লাগল। মাঠগুলো কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। চারদিক ঝাপসা হতে হতে ক্রমে সমস্ত চরাচর জুড়ে নেমে এল অন্ধকার। এবার সময় হয়েছে! পেত্রোর মন আনন্দে নেচে উঠল। এক মুহূর্ত দেরি না-করে বেরিয়ে পড়ল সে সে। গভীর বন, রাত আঁধার। তার ভেতর দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে পেত্রোকে যেতে হচ্ছিল। বনটা পেরিয়ে একটা গভীর খাদ। তার নাম ভালুকডাঙা। বাসাভ্রিয়ুক আগেই সেখানে হাজির। অন্ধকার এত গাঢ় যে, মুখের কাছে হাত নিয়ে এলেও দেখা যায় না। হাতে হাত ধরে তারা জলকাদা ভেঙে এগোতে লাগল। চারদিকে কাঁটাগাছ তাদের খপ করে টেনে টেনে ধরে, পদে পদে ভয় হুমড়ি খেয়ে পড়বার। শেষ পর্যন্ত একটা সমতল জায়গায় গিয়ে তারা পৌঁছুল। পেত্রো থেমে পড়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল—এর আগে এ জায়গায় কই সে তো কখনও আসেনি। বাসাভ্রিয়ুকও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সামনে ওই যে তিনটে টিলা, ওখানে গেলে দেখতে পাবে রাজ্যের ফুল ফুটে আছে। খবরদার, ওর একটি ফুলও যেন তুল না, তাহলে মরবে। কিন্তু যেই দেখবে আকাশলতার ফুল, অমনি ফুলটা ছিঁড়ে নেবে। নিয়ে আর ফিরে তাকাবে না, যেই তোমার পিছু নিক-না কেন।'

পেত্রো ভেবেছিল একটা কথা জিজ্ঞেস করে নেবে। কিন্তু তার আগেই বাসাভ্রিয়ুক হাওয়া। অগত্যা পেত্রো টিলা তিনটির কাছে এগিয়ে গেল। ফুল না ছাই-বন। গুমোটের সময়; আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তার আলোয় পেত্রো দেখতে পেল সামনে রাশি রাশি ফুল। অমন আশ্চর্য আশ্চর্য ফুল পেত্রো জন্মেও দেখেনি। তার মধ্যে রয়েছে মামুলি আকাশলতার কুঁড়ি। কোমরে হাত দিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পেত্রো। মামুলি আকাশলতার গাছ দেখে কেমন যেন তার ধাঁধা লাগতে লাগল।

'এর মধ্যে আর নতুনত্ব কী। ও গাছ তো অষ্টপ্রহর দেখছি। এমন কিছু জিনিস নয় যে লোকে দেখে অবাক হবে। শয়তানটা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেনি তো?'

ঠিক সেই সময় দেখা গেল আকাশলতার একটা ছোট্ট কুঁড়ি এমনভাবে হেলেদুলে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে যে মনে হয় যেন জ্যান্ত। সে এক অবাক কাণ্ড। হেলছে দুলছে আর বড় হচ্ছে। বড়, ক্রমশ বড় হতে হতে ঠিক জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো লাল টকটকে হয়ে উঠল। তারপর তার ভেতর থেকে দেখা দিল যেন ছোট্ট একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফট করে একটা শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে পেত্রোর চোখের সামনে চারদিক আলোয় আলো করে পাপড়ি মেলে দিল আকাশলতার ফুল।

www.pathagar.com

'এইবার, এই হল সময়!' আপন মনে বলতে বলতে পেত্রো হাত বাড়িয়ে দিল। হঠাৎ সে দেখল তার পেছন থেকে শত শত লোমশ হাত ফুলটার দিকে ছুটে আসছে; পেত্রোর ঠিক পেছনে কারা হুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে। চোখ বুঁজে বোঁটা ধরে টান দিতেই ফুলটা পেত্রোর হাতে এসে গেল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা। সামনে একটা গাছের গুঁড়ির উপর দেখা গেল বাসাভ্রিয়ুক বসে—মড়ার মতো নীল হয়ে গেছে সে। নিঃস্পন্দ দেহে সে একদিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল; তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, মুখে রা নেই। চারপাশ থমথম করছে। তারপর এক সময়ে সেই অসহ্য নীরবতা ভঙ্গ করে শিস্ বেজে উঠল। পেত্রোর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল সেই আওয়াজে। তার মনে হল ঘাসগুলো গুজগুজ ফিসফাস করছে, ফুলের দল নিজেদের মধ্যে গুনগুনিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। গাছের গায়ে ঠাস্ ঠাস্ করে এসে লাগছে ক্রুদ্ধ হাওয়া। বাসাভ্রিয়ুকের মুখ দেখে মনে হল এতক্ষণে তার ধড়ে প্রাণ এসেছে। চোখ দুটো তার চকচক করে উঠল। বিড়বিড় করে তাকে বলতে শোনা গেল : 'অখদ্যে মাগী, এতক্ষণে আসা হল! দেখ পেত্রো, এখুনি এক পরমা সুন্দরী কন্যা তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। সে যা করতে বলবে তাই করো। নইলে কিন্তু তোমার সর্বনাশ হবে।'

বলে একটা পাকানো লাঠি দিয়ে এক কাঁটাঝোপ সরিয়ে দিল। ঝোপটা সরাতেই দেখা গেল—রূপকথায় যাকে বলে ডাইনিবুড়ির বাসা। বাসাভ্রিয়ুক একটা ঘুসি মারতেই দেয়ালটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর তেড়ে এল তাদের দিকে। দেখতে দেখতে কুকুরটা ভোল বদলে ফেলে হয়ে গেল একটা বেড়াল। তারপর সেই বেড়ালটা ফ্যাঁশ্ ফ্যাঁশ্ শব্দ করতে করতে তাদের চোখের দিকে থাবা বাড়িয়ে দিল।

শুনলে-পরে কানে আঙুল দিতে হয় এমনি একটা গালাগাল দিয়ে বাসাভ্রিয়ুক বলে উঠল, 'র র' বুড়ি, মেজাজ দেখাস্‌নে' যেখানে বেড়ালটা দাঁড়িয়ে ছিল, দেখা গেল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মাজা-পড়ে-যাওয়া এক থুত্থুরে বুড়ি। পোড়া আপেলের মতো গায়ের চামড়া তার কোঁচকানো। তার চিবুকে নাক এসে ঠেকেছে সুপুরি-কাটা জাঁতির মতো।

পেত্রো মনে মনে বলল, 'পরমা সুন্দরীই বটে।' দেখে গা তার শিউরে উঠল।

ডাইনিবুড়ি ছোঁ মেরে তার হাত থেকে ফুলটা কেড়ে নিয়ে তার উপর জল ছিটিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর পেত্রোকে ফুলটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'দূর করে ওটা তুলে ফেলে দাও।' ফেলে দিতে গিয়ে পেত্রো তো অবাক। অন্ধকারে ফুলটাকে দেখাচ্ছিল যেন আগুনের একটা গোলা। হাওয়ায় নৌকোর মতো অনেকক্ষণ ধরে ভাসতে ভাসতে ফুলটা এতদূরে গিয়ে মাটিতে পড়ল যে, দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন পোস্তার দানার মতো এতটুকু একটা নক্ষত্র। বুড়ি হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, 'হুই হোথায়!' বাসাভ্রিয়ুক পেত্রোর হাতে একটা কোদাল দিয়ে বলল, 'যাও পেত্রো, ওই জায়গায় গিয়ে মাটি খোঁড়ো। ওখানে তুমি এত সোনা পাবে, যা তুমি কেন কোর্ঝও কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।'

পেত্রো হাতে থুথু ছিটিয়ে কোদালটা বাগিয়ে পা দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে চাড় দিয়ে মাটি ওঠাতে লাগল।... দু চাঙড়, তিন চাঙড়, চার চাঙড় মাঠি ওঠানোর পরে কোদালের মুখে ঠং করে একটা শব্দ হল। পেত্রো তাকিয়ে দেখে লোহার শেকল-আঁটা ছোট্ট একটা সিন্দুক। হাত বাড়িয়ে যতই সে ধরবার চেষ্টা করে সিন্দুকটা ততই মাটির নিচে সেঁধিয়ে যায়। পেত্রো শুনতে পেল তার পেছনে দাঁড়িয়ে সাপের মতো হিস্ হিস্ করে কে যেন খিলখিলিয়ে হাসছে।

www.pathagar.com

'হেঁ, হেঁ—সোনা কি আর অমনি মেলে? মানুষের রক্ত চাই।' বলে সাদা চাদরে মোড়ানো বছর ছয়েকের একটি ছেলেকে এনে ডাইনিবুড়ি পেত্রোকে ইশারা করে বলল তার গলা কাটতে। পেত্রো তো হতভম্ব। ডাইনি বলে কী! মিছিমিছি একটা মানুষকে সে খুন করবে! তার ওপর নিরপরাধ একটি শিশুকে। রেগে গিয়ে সে ছেলেটার মুখের চাদর টান দিয়ে সরিয়ে দিল। দিতেই দেখে—সামনে ইভাস দাঁড়িয়ে। হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করা, মাথাটা নামানো, পেত্রো ক্ষেপে গিয়ে ছোরা উঁচিয়ে ডাইনির দিকে তেড়ে গেল।

বাসাভ্রিয়ুক গর্জে উঠল, 'এই-না তুমি বলেছিলে মেয়েটার জন্যে তুমি সবকিছু করতে রাজি?' কথাগুলো পেত্রোর গায়ে যেন গুলির মতো বিঁধল। বুড়ি মাটিতে পা ঠুকল। অমনি ভেতর থেকে একটা নীল শিখা উঠে মাটির নিচেটা আলোয় আলো করে তুলল; দেখে মনে হল মাটির তলাটা যেন স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি। নিচের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ওদের ঠিক পায়ের নিচে স্তূপাকার হয়ে আছে সিন্দুকভর্তি হীরাজহর আর ঘড়া ঘড়া মোহর। দেখে চকচক করে উঠল পেত্রোর চোখ, মাথা ঘুরতে লাগল। মরিয়া হয়ে সে ছুরি চেপে ধরল। তার চোখে ফিন্‌কি দিয়ে উঠল নিষ্পাপ শিশুর রক্ত। চারদিকে পৈশাচিক হাসি ফেটে পড়ল। কিম্ভূত-কিমাকার একপাল দৈত্যদানো তার সামনে নেচে-কুঁদে বেড়াতে লাগল। মুণ্ডুহীন ধড়টা দু'হাতে তুলে ধরে ডাইনিবুড়ি নেকড়ের মতো চকচক করে রক্ত খাচ্ছিল। পেত্রোর মাথা ঘুরছিল বন্ বন্ করে। আর থাকতে না-পেরে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। তার চারপাশে সমস্ত কিছু লালে লাল। রক্তাক্ত গাছগুলো যেন জ্বলে-পুড়ে গোঙাচ্ছে। লাল গন্‌গনে আকাশ যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেন বিদ্যুতের মতো তার সামনে আগুন ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে। ছুটতে ছুটতে কোনোরকমে নিজের কুঁড়েঘরে এসে পেত্রো মেঝের উপর সপাটে আছড়ে পড়ল। তার সমস্ত শরীর জুড়ে নেমে এল যেন কালঘুম।

দু'দিন দু'রাত সে অকাতরে ঘুমুল। তিন দিনের দিন সে চোখ খুলল। ঘরের আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ সে ঠায় তাকিয়ে থাকল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না কী ঘটেছে। তার স্মৃতিশক্তিটা হয়ে দাঁড়াল যেন কঞ্জুস বুড়োর পকেট—সে-পকেট থেকে কানাকড়িও কেউ গলিয়ে আনতে পারবে না। আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে হঠাৎ তার পায়ে লেগে ঠং করে একটা শব্দ হল। পেত্রো চেয়ে দেখল তার পায়ের কাছে মোহরভর্তি দুটো থলে। তখন তার স্বপ্নের মতো সব মনে পড়ল : গুপ্তধনের খোঁজে সে গিয়েছিল; সঙ্গে তার কেউ ছিল না, বনের মধ্যে সে বেজায় ভয় পেয়েছিল। সোনাদানা কিসের বিনিময়ে কেমন করে সে পেয়েছে—সেসব বিন্দুবিসর্গ কিছুই তার মনে নেই।

সোনাদানা দেখে কোর্ঝ-এর মন গলে গেল। পেত্রো হেন, পেত্রো তেন—পেত্রোর প্রশংসায় কোর্ঝ পঞ্চমুখ তখন। 'চিরদিনই পেত্রো আমার বড় আদরের, নিজের ছেলের মতোই ওকে আমি দেখে এসেছি।' বুড়ো এমন শুরু করে দিল যে, পেত্রোর চোখেও জল এসে গেল। পিদর্কা বলতে লাগল কীভাবে একদল বেদে এসে ইভাসকে চুরি করে নিয়ে গেছে; কিন্তু অখদ্যে পিশাচের দল পেত্রোকে এমনভাবে গুণ করেছিল যে, হাজার চেষ্টা করেও ইভাসের মুখ সে মনে করতে পারল না।

শুভস্য শ্রীঘ্রম্। সুতরাং পোল আপদটাকে হুড়ো দিয়ে বিদায় করে তাড়াতাড়ি একটা দিন দেখে বিয়ের ব্যবস্থা হতে লাগল। বিয়ের নাড়ু ভাজা হল, রুমাল-তোয়ালের মুড়ি সেলাই হল, পিপেভর্তি ভোদ্‌কা ঘোঁটা হল, ছেলে-ছোকরাদের ওপর পরিবেশনের ভার

www.pathagar.com

দেওয়া হল, মাঙ্গলিক রুটি কেটে ভাগ করা হল। ব্যাগপাইপ, সানাই, করতাল, বন্দুরা বেজে উঠল। শুরু হল আনন্দ উৎসব।

সেকালে বিয়েতে যে ধুমধড়াক্কা হত, তার তুলনায় আজকালকার বিয়ে তো কিছুই নয়। সে সব গল্প শুনতে হত আমার ঠাকুর্দার পিসির মুখে—খাসা বলতেন তিনি। ঘরের মধ্যে গোল হয়ে ঘুর্ণি হাওয়ার মতো ঘুরে ময়ূরের মতো নাচতে নাচতে এল আইবুড়ো মেয়ের দল। তাদের মাথায় হলদে, নীল, গোলাপি ফিতের জরিদার বাহারে টুপি, পরনে রুপালি চুমকি-বসানো লাল রেশমি সুতোর কশিদা-করা পাতলা ঢিলে জামা, পায়ে লোহার নাল-লাগানো মরক্কো চামড়ার গোড়ালি-তোলা জুতো। লাল আঁচল উঠিয়ে নীল রেশমের দামি কোর্তা পরে নতুন বৌয়ের দল এর সাড়ম্বরে হাতে হাত গলিয়ে কোমর ধরে; একে একে বেরিয়ে এসে তারা তালে তালে হোপাক নাচ নাচল। তারা মাথায় পরেছিল নৌকোর মতো সাজ; তার চুড়োর পেছনে খাঁজ-কাটা সোনালি পাটি; ফাঁকটুকু দিয়ে ঝিলিক দিচ্ছিল জরির টুপি তাতে সামনে-পেছনে আঁটা কালো আস্ত্রাখানের দুটো করে শিং। তাদের সঙ্গে নেচে-কুঁদে একশা হয়ে বেড়াল সিড়িঙ্গে কসাক টুপি পরা ছেলেছোকরার দল; গায়ে তাদের বুটিদার কমিআঁটা মিহি সুতোর কার্মি, ঠোঁটের কোণে পাইপ। কোর্ঝও আর স্থির থাকতে না পেরে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে পড়ল। হাতে একটা বন্দুরা নিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, মাথার উপর বসানো পেয়ালা সামলাতে সামলাতে, কোর্ঝ গান গেয়ে গেয়ে নাচতে শুরু করে দিল। আর, একবার ফুর্তি জমে উঠলে যা হয়। লোকের তখন জ্ঞান থাকে না। অমনি নানারকম মুখোশ পরা শুরু হয়ে গেল। রাম বল, কী চেহারাই-না সব হল—ঠিক যেন একেকটি আস্ত রাক্ষস। আজকালকার বিয়ের সঙ আর সেকালের মুখোশ-আঁটা ভাঁড়—দুটোর কোনও তুলনাই হয় না। একালে কী হয়? না, কেউ সাজে বেদেনি, কেউ মস্কোর বড় শহুরে। কিন্তু সেকালে একজন সাজত ইহুদি আর একজন ব্রহ্মদত্যি। প্রথমে এ ওকে চুমো খাবে, তারপর চুলোচুলি করবে। কী বলব, হাসতে হাসতে লোকের পেট ফেটে যাবার যোগাড় হত। তারা তুর্কি কিম্বা তাতারদের আগুনরঙের লাল টুকটুকে পোশাক পরত। একবার তারা ভাঁড়ামো আর রঙ্গরস করতে শুরু করলে তার আর হদ্দমুদ্দ থাকত না। মজার ব্যাপার হয়েছিল আমার ঠাকুর্দার পিসিকে নিয়ে। উনিও ছিলেন ঐদিন বিয়েবাড়িতে। হাতে একটা পেয়ালা নিয়ে উনি সবাইকে আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন। পরনে ছিল ওঁর তাতারদের ঢিলে পোশাক। কারো মাথায় বোধ হয় ভূত চেপেছিল। সে করল কী পেছন থেকে ওঁর গায়ে ভোদকা ছিটিয়ে দিল। আরেক জন ছিল, সে আবার আরেক কাঠি ওপর দিয়ে যায়—সে করল কী ফস্ ক'রে আগুন ধরিয়ে দিল। দপ ক'রে আগুন জ্বলে উঠতেই বেচারা পিসি করলেন কী ভয়ে ময়ে সবাইকার সামনেই গা থেকে জামা-কাপড় টেনে টেনে খুলে ফেললেন। পিসিকে উদোম হতে দেখে সে কী হৈচৈ, হুল্লোড় আর হাসির হররা—বিয়ে তো নয়, যেন মেলা! লোকে বাপের জন্মেও বিয়েতে অমন ফুর্তি দেখেনি।

পিদর্কা আর পেত্রো রাজার হালে থাকতে লাগল। ঘরে তাদের অঢেল জিনিস—সমস্তই আনকোরা নতুন। তাদের চাল দেখে পাড়ার নিরীহ লোকেরা কিন্তু বলাবলি করতে লাগল : 'ভূতপেত্নী কারো ভালো করে না। পেত্রোকে অত টাকা দিল কে? নিশ্চয় সৎ খ্রিস্টানদের মাথা-খাওয়া নচ্ছারটা। নইলে ঘড়া ঘড়া মোহর পাবেই-বা কোথায় থেকে? এ-ও বোঝ না, যেদিন থেকে পেত্রো বড়লোক হল সেইদিন থেকেই বাসাড়িয়ুক হাওয়া?'

তোমরা হয়তো বলবে, বানিয়ে বলা লোকের স্বভাব। কিন্তু তা নয়। এক মাস যেতে না-যেতেই দেখা গেল পেত্রো আর সে পেত্রো নেই। তাকে যে কিসে ভর করল, ঈশ্বরই

www.pathagar.com

জানেন। সারাদিন গুম হয়ে বসে থাকে: সব সময় তার কী যেন চিন্তা, দেখে মনে হত কী একটা কথা যেন মনে করবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে পিদর্কা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে কথা বলাত, তখন সে খানিকটা স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তায় মেতেও উঠত। কিন্তু যেই দৈবাৎ থলিগুলোর দিকে তার চোখ প'ড়ে যেত, অমনি সে বলে উঠত, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, কিছুতেই মনে পড়ছে না।' বলে আবার সে যে-কে সেই। ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়ে কী-একটা কথা মনে করবার চেষ্টা করত। ঠায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে কখনও কখনও তার মনে হত এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছু তার মনে পড়ে যাবে... কিন্তু ঠিক পরক্ষণেই তার সে ভাব আর থাকত না। কল্পনায় তার মনে হত, যেন একটা সরাইখানায় সে বসে আছে; ওদের ভোদ্‌কা খেতে দেয়া হল; ভোদ্‌কাটা জঘন্য; কে-একজন এসে ওর কাঁধের উপর চাপড় মারল—কিন্তু তারপর সবকিছু গুলিয়ে যায়। কিছুই আর মনে করতে পারে না। সারা মুখে দরদর করে ঘাম ছুটতে থাকে; তারপর হয়রান হয়ে আবার বসে পড়ে।

পিদর্কা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ওঝা এসে জলপড়া দিয়েছে, ঝাড়ফুঁক করেছে—কিছুতেই কিছু হয়নি। এমনি করে গরমের ক'টা মাস কেটে গেল। কসাকদের অনেকেরই মাঠ নিড়োনো, ফসল কাটা শেষ। যাদের জানের পরোয়া নেই, তারা গেছে যুদ্ধে। জলায় তখনও দলে দলে পাতিহাঁস ঘুরে বেড়ালেও রেন্‌পাখি একটিও নেই। ঘাসজমি শুকিয়ে লাল হয়ে আছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে ডাই হয়ে আছে কাটা ফসল। রাস্তায় বেরোলেই চোখে পড়বে লক্‌ড়ির গাড়ি। মাটি ঝামার মতো শক্ত, জায়গায় জায়গায় বরফের ছোপ। সবে তুষার পড়তে শুরু করেছে, গাছের কচি কচি ডালে খরগোশের রোঁয়ার মতো গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ। তুষার-ঝরা দিনগুলোতে বুল্‌ফিঞ্চ পাখি বরফের স্তূপে মুখ গলিয়ে দানা খুঁজে বেড়ায়, তার হাবভাব দেখে মনে হয় যেন পোলদেশের ফুলবাবু। ছোটো ছোটো ছেলেরা বরফের উপর ইয়া বড় লাঠি দিয়ে কাঠের লাটিমের গায়ে ছটকা মারে; আর তাদের বাবারা চুপচাপ চুল্লির ধারে বসে থাকে, মাঝে মাঝে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাইরে এসে স্বধর্মপরায়ণ বরফের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ে কিংবা একটু হাওয়া খেয়ে নিয়ে খামারবাড়িতে ধান মাড়াই করতে চলে যায়।

শেষপর্যন্ত একদিন বরফও গলতে শুরু করল। কথায় বলে, পাইক মাছ তার ল্যাজার ঝাপটায় বরফ ভাঙে। পেত্রো কিন্তু যে-কে সেই। বরং দিনে দিনে তার বিমর্ষভাব আরো বেড়ে যায়। ঘরের মাঝখানে ঠায় বসে থাকে—তার পায়ের গোড়ায় পড়ে থাকে মোহরের থলি। কারো সঙ্গে মেশে না, মাথায় একমাথা চুল, দেখলে ভয় লাগে। সবসময় তার এক চিন্তা : কী-একটা কথা কেবলি মনে করতে চায়, না-পেরে রাগে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়ে। প্রায়ই সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে এমনভাবে হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় যেন কিছু একটা জিনিস ধরতে চাইছে। তার ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করে নড়তে থাকে, যেন দূরবিস্তৃত একটা শব্দ সে মুখে আনবার চেষ্টা করেছে। তারপর নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আবার। হঠাৎ তাকে ক্ষ্যাপামিতে পেয়ে বসে; পাগলের মতো নিজের হাত দুটো আঁচড়াতে কামড়াতে থাকে। টেনে টেনে নিজের চুল ছেঁড়ে। তারপর আস্তে আস্তে আবার সে শান্ত হয়ে যায়, তলিয়ে যায় বিস্মরণের মধ্যে। তারপর আবার সে মনে করবার চেষ্টা করবে, আবার রাগে আর যন্ত্রণায় অধীর হবে। এ যেন স্বয়ং ঈশ্বরের মার।

পিদর্কার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। গোড়ায় গোড়ায় বাড়িতে একা থাকতে তার ভয় করত, ক্রমে দুঃখ জিনিসটা বেচারার গা-সহা হয়ে গেল। আগেকার সে-পিদর্কাকে এখন আর দেখে চেনাই যায় না; না-আছে তার গালের সে-লালিমা, না-আছে মুখের সে-হাসি;

www.pathagar.com

এখন তার রোগা হাড়-জিলজিলে চেহারা, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। একদিন তার দুঃখ দেখে থাকতে না-পেরে একজন তাকে বলল : ভালুকডাঙার ডাইনিবুড়ির কাছে যেতে—হেন রোগ নেই যা সে ভালো করতে না-পারে। পিদর্কা ঠিক করল যা থাকে কপালে একবার শেষ চেষ্টা সে করে দেখবে। আস্তে আস্তে বুড়িকে একদিন সন্ধেবেলা সে তার বাড়িতে আসতে রাজি করাল। ঠিক তার পরের দিন সেন্ট জনের পরব। পেত্রো বেঞ্চির উপর অন্যমনস্ক হয়ে শুয়ে ছিল, বুড়ি কখন ঘরে ঢুকেছে সে দেখেনি। কিন্তু একটু একটু করে তার হুঁশ ফিরে আসতেই বুড়ির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে সে উঠে বসল। হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে লাগল তার সমস্ত শরীর; এমন বীভৎসভাবে সে হেসে উঠল যে, পিদর্কার অন্তরাত্মা খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম হল! 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে' বলে একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে সজোরে সে বুড়ির দিকে ছুঁড়ে মারল। পুরু দরজা ভেদ করে কুড়ুলটা গেঁথে রইল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল, আর ঘরের ঠিক মধ্যিখানে দেখা গেল সাদা শার্ট পরা মাথায় কাপড় দেওয়া বছর সাতেকের একটি ছেলে। তার মুখের ঢাকাটা সরে গেল। 'ইভাস!' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে পিদর্কা তার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু সেই ছায়ামূর্তির আপাদমস্তক রক্তে ভেসে যাচ্ছে, রক্তের লাল আলোয় সারা ঘর ছেয়ে গেল। ভয়ে আঁৎকে উঠে পিদর্কা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাইকে সাহায্য করবার জন্যে আবার যেই ঘরে ঢুকতে যাবে—দেখল দরজা এমন এঁটে বন্ধ হয়ে গেছে যে খোলবার উপায় নেই। পাড়াপড়শিরা ছুটে এল; অনেক ধাক্কাধাক্কির পর শেষ পর্যন্ত তারা দরজা ভেঙে ফেলল। ভেতরে জনপ্রাণী নেই! ঘরের ভেতরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া—ঘরের ঠিক মাঝখানটায় যেখানে পেত্রো দাঁড়িয়েছিল, সেখানে স্তূপাকার ছাই থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছিল। ছুটে গিয়ে থলিগুলো খোলা হল, তার মধ্যে মোহর নেই—শুধু খোলামকুচিতে ভর্তি। সামনে এই রকমের অঘটন ঘটতে দেখে চোখ কপালে তুলে কসাকরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল—একটু ভুরু পর্যন্ত নড়াবার সাহস হল না তাদের।

পরে কী ঘটেছিল আমার মনে নেই। পিদর্কা তীর্থে যাবার ব্রত নিয়েছিল। তার বাবা তার জন্যে যা কিছু রেখে গিয়েছিল, সমস্ত নিয়ে একদিন সে রোম ছেড়ে চলে যায়। পিদর্কা কোথায় গিয়েছিল কেউ জানে না। সে সময়ে জোর গুজব ছিল, পেত্রো যেখানে গেছে পিদর্কাও সেখানেই গেছে। কিন্তু পরে কিয়েভ থেকে একজন কসাক এসে বলে গিয়েছিল সে কিয়েভের মঠে একজন তপস্বিনীকে দেখেছে, তার অস্থি-চর্মসার চেহারা, সারাক্ষণ বসে বসে সে জপতপ করে। বর্ণনা শুনে গ্রামবাসীরা ধরে নিয়েছিল সে তপস্বিনী পিদর্কা না-হয়ে যায় না। লোকটি বলেছিল, সেই তপস্বিনীকে কেউ কখনও একটিও কথা বলতে শোনেনি। মেয়েটি নাকি পায়ে হেঁটে ঐ মঠে গিয়েছিল এবং ঈশা-জননীর বিগ্রহের জন্যে যে রত্নখচিত চালচিত্রটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তার দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। পেত্রোকে যেদিন ঘাড় মটকে নিয়ে গেল, সেই দিনই বাসাভ্রিয়ুককে আবার গ্রামের মধ্যে দেখা গেল। গ্রামের লোকে তাকে দেখলেই পালায়, কাছে ঘেঁষে না কেউ। ওর আসল রূপ সকলের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বাসাভ্রিয়ুক হল নররূপী শয়তান—ওর কাজ গুপ্তধন খুঁজে বার করা। মনে ময়লা থাকলে গুপ্তধন ছোঁয়া যায় না। তাই নিজের কাজ উদ্ধারের জন্যে ডানপিটে ছেলে-ছোকরাদের সে ফাঁদে ফেলে। সেই বছরই পাড়ার সবাই তাদের পুরনো ঘরদুয়োর ছেড়ে কাছেই একটা বড় গ্রামে উঠে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়েও তারা বাসাভ্রিয়ুকের হাত থেকে রেহাই পেল না। আমার ঠাকুর্দার পিসি বলতেন, পাশ্‌নিয়া রোডের পুরনো সরাইখানাটা তুলে দেওয়ায় ওর ওপর বাসাভ্রিয়ুক হাড়ক্ষ্যাপা ক্ষেপেছিল; বাসাভ্রিয়ুক তাই ওঁকে সবসময় চিট করবার

www.pathagar.com

চেষ্টা করত। একদিন পিসির সরাইখানায় গাঁয়ের মোড়লেরা টেবিলে খেতে বসেছে। মাঝখানে আস্ত একটা ভেড়ার রোস্ট—তা নেহাৎ ছোটো নয়। মোড়লেরা নানারকম গাল-গল্প করছে; কে কী আজব ব্যাপার ঘটতে দেখেছে বলছে। হঠাৎ সকলের একসঙ্গে মনে হল—একজনের মনে হলে কিছু আসত-যেত না, কিন্তু একই সঙ্গে সকলেরই নজরে পড়ল—ভেড়াটা মাথাচাড়া দিচ্ছে, কালো কুৎকুতে চোখ দুটো চকচক করছে, তার ধড়ে প্রাণ ফিরে আসছে। হঠাৎ সে খোঁচা খোঁচা কালো গোঁফ খাড়া করে এমনভাবে উঁচিয়ে ধরল যে, দেখলে ভয় লাগে। ভেড়ার মুণ্ডুটার দিকে তাকাতেই সবাই বুঝল ওটা আসলে বাসাভ্রিয়ুকের মুখ; আমার ঠাকুর্দার পিসিমার এ-ও মনে হল, হতচ্ছাড়া এই বুঝি ভোদকা চেয়ে বসে। বুড়ো মোড়লেরা যে যার টুপি উঠিয়ে চটপট বাড়ির দিকে পিট্টান দিল। আরেকদিনের কথা। গির্জার খোদ দারোয়ান মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে বাড়ির গেলাসে সরাব খেতে ভালোবাসত। বার দুই গেলাসই খালি করবার পরই দেখে গেলাসটা নুয়ে পড়ে তাকে কুর্নিশ করছে। সঙ্গে সঙ্গে 'দূর হ, দূর হ' ব'লে সে চেঁচিয়ে উঠে রামনাম করে। ঠিক সেই সময় তার স্ত্রীও এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখে। একটা বড় নাদার মধ্যে বেচারা সবে ময়দার তাল বানিয়েছে, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ নাদাটা লাফাতে লাফাতে চলতে শুরু করে দিল। 'রও, রও'! কিন্তু কে কার কথা শোনে! কোমরে হাত ঝুলিয়ে নাদাটা সারা বাড়ি নেচে-কুঁদে বেড়াতে লাগল। তোমরা হাসছ, কিন্তু আমাদের বাপদাদাদের কাছে ব্যাপারটা মোটেই হাসির ছিল না। যদিও ভূত তাড়াবার জন্যে তারপর ফাদার আফানাসি সারা গ্রামের রাস্তাঘাট শান্তির জল ছিটিয়ে বেড়ালেন, তবু আমার ঠাকুর্দার পিসিমাকে বহুদিন পর্যন্ত বলতে শোনা যেত, সন্ধে হলেই কে যেন তাঁর ছাদের উপর ঠকঠক শব্দ করে নখ দিয়ে দেয়াল আঁচড়ায়।

এই যে! যেখানটায় আমাদের গ্রাম, তোমাদের মনে হবে : কই? কিছুই তো নেই! কিন্তু বেশিদিন আগের কথা নয়, আমার বাবার আমলে—সেসব কথা আমারও কিছু মনে আছে—সরাইখানার ভাঙা ইঁট পেরিয়ে যাবার সাধ্যি ছিল না কারো, মেচ্ছরা তো তার ঢের পরে নিজেদের খরচে ওটা মেরামত করে নিয়েছে। কালিঝুলি মাখা চিমনিটা দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া বেরিয়ে এত উঁচুতে গিয়ে ঠেকত যে মাথা তুলে দেখতে গেলে মাটিতে টুপি পড়ে যেত। চারদিকে গরম গরম ছাই-ভস্ম ছড়িয়ে পড়ত। আর সেই শয়তানটা—সে হারামজাদার কথা বলে কাজ নেই—সে তার গর্তে বসে হাঁউ-মাউ করে এমন মড়াকান্না জুড়ে দিত যে, কাছাকাছি জঙ্গলের দাঁড়কাকেরা ভয় পেয়ে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ত আর তারপর গাঁক-গাঁক করে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে সারা আকাশটা মাথায় করত।

www.pathagar.com

সরোচিনেৎসের মেলা

এক

ঘরে আর মনে টেকে না।
নিয়ে যা ঘরের বার, ঘরের বার,
যেথাকে গোলমালে একাকার,
যেথাকে কুমারীরা নেচে চলে,
যেথাকে মাতন লাগায় ছেলের দলে!
প্রাচীন কিংবদন্তী থেকে

মালোরুশিয়ায় গ্রীষ্মের দিনগুলো কী মদির, কী উচ্ছল! কী তাপশ্রান্ত সেই সময়টা যখন নৈঃশব্দে ও উত্তাপে জ্বলজ্বল করে মধ্য দিন আর অপার নীল গগন একটা কামনামধুর গম্বুজের মতো উপুড় হয়ে থাকে পৃথিবীর উপর, মনে হয় যেন নিজের শূন্যের আলিঙ্গনে সুন্দরীকে সজোরে পাশবদ্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে বিভোর হয়ে! সে আকাশে মেঘ নেই। মাঠে শব্দ নেই। সব যেন মরে গেছে; শুধু উপরে আকাশের গহীনে ঝঙ্কার তোলে ভরত পাখি, আর শূন্যের সিঁড়ি বেয়ে প্রেমাতুর মাটিতে নেমে আসে তার রুপোলি গান, আর থেকে থেকে স্তেপভূমিতে শোনা যায় গাঙচিলের ডাক নয়ত বনমুরগির কাংস্যকণ্ঠ। প্রকাণ্ড ওক গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে অলস নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে, যেন উদ্দেশ্যহীন একটা আড্ডা জমিয়েছে তারা, আর রোদের চোখধাঁধানো আঘাতে ঝলসে ওঠে পুরো একসার চিত্রার্পিত পল্লবগুচ্ছ, সেইসঙ্গে অন্য আর এক সারের ওপর নিক্ষিপ্ত হয় রাত্রির মতো কালো ছায়া—শুধু জোর বাতাস বইলেই যে ছায়ায় সোনা ফুটে ওঠে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ফুলগুলো মাথা বাড়িয়ে থাকে রঙচঙা সবজিক্ষেতগুলোর উপর, আর বাতাসে ভেসে বেড়ায় নানা পতঙ্গের চুন্নিপান্না। বিচালির ধূসর স্তূপ আর শস্যের সোনালি গাদা ছাউনির মতো ছড়িয়ে থাকে মাঠে, ডেরা বাঁধে তার অসীমতায়। চেরি, পাম, আপেল, নাসপাতির ফলভারানত প্রসারিত শাখা; আকাশ—তার নির্মল মুকুর, গর্বোন্নত শ্যাম তটের মধ্যে নদী—কী মদালস তৃপ্তিতে ভরা এই মালোরুশিয়ার গ্রীষ্ম!

এমনি উচ্ছলতায় জ্বলজ্বল করেছিল আগস্টের এক তপ্ত দিন, সালটা হবে আঠার শ... আঠার শ... মানে তারো বছর তিরিশ আগে, যেদিন সরোচিনেৎস গ্রাম পর্যন্ত দশ ভের্স্ট রাস্তাটা সবই হয়ে উঠেছিল লোকে লোকারণ্য, দূরের-কাছের সমস্ত খামার থেকে লোক যাচ্ছিল মেলায়। সকাল থেকেই নুন আর মাছ নিয়ে গাড়ির যে সারি শুরু হয়েছিল তার আর শেষ ছিল না। খড়বিচালির মধ্যে বসানো হাঁড়িকলসির পাহাড় চলছিল ধীরে ধীরে, বোধ হচ্ছিল যেন তারা তাদের বন্দিদশা ও অন্ধকারে ব্যাজার; শুধু কোথাও কোথাও উঁচু করে বাঁধাছাঁধা বেড়ার উপর থেকে সগর্বে উঁকি দিচ্ছিল রঙচঙে কোনো সরা বা ভাঁড় এবং সমঝদারদের সকাম দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। অনেক পথচারীই ঈর্ষাভরে তাকাচ্ছিল এই ধনসম্পত্তির মালিক লম্বাপনা

www.pathagar.com

কুম্ভকারটির দিকে। ধীর পদক্ষেপে সে যাচ্ছিল তার পশরার পেছন পেছন, তার এই মৃন্ময় গরবী-গরবিনীদের সে ফের সযত্নে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল ওই অসহ্য বিচালির গাদায়।

রাস্তায় একপাশ দিয়ে ক্লান্ত বলদে-টানা বস্তা, শন, সাদা কাপড় আর নানা রকম সাংসারিক জিনিসে ভরা একটা গাড়ি যাচ্ছিল আলাদাভাবে, পেছন পেছন তার মালিক, গায়ে পরিষ্কার একটা কামিজ কিন্তু পরনের পাজামাটায় ময়লা লাগা। তার গাঢ় রঙের মুখের উপর যে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছিল, এমনকি তার লম্বা মোচ বেয়ে গড়িয়েও পড়ছিল, সেই ঘামটা সে মুছে নিচ্ছিল অলস হাতে, সে মুখে তার এমন এক প্রসাধন যা দিয়ে এক নির্দয় প্রসাধনকর বিনা আহ্বানেই সুন্দরী-কুৎসিত সকলের কাছেই জোর করে এসে হাজির হয়ে আজ হাজারকয়েক বছর ধরে মানবজাতির সবাইকেই প্রসাধিত করে আসছে। তার পাশে পাশেই চলেছে গাড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা মাদি ঘোড়া, তার শান্তশিষ্ট হাবভাব দেখেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে। বহু পথচারীই, বিশেষ করে জোয়ান ছেলেরা আমাদের এই চাষিটির কাছাকাছি এসে সম্মান দেখাচ্ছিল টুপি খুলে। কিন্তু এটা তারা যে করছিল শুধু লোকটির শ্বেত গুম্ফ ও ভারিক্কি চালচলনের জন্যে তা নয় : দৃষ্টিটা একটু উপরে তুললেই সম্মান প্রদর্শনের কারণ বোঝা যায়। গাড়ির মালপত্তরের উপর বসেছিল সুন্দরী একটি মেয়ে, গোলগাল মুখ, কালো দুটি ভুরু তার উজ্জ্বল বাদামি চোখের উপর নিটোল হয়ে বেঁকে আছে ধনুকের মতো; গোলাপি ঠোঁটদুটিতে নিশ্চিন্ত হাসি, লম্বা বেণীগুচ্ছে লাল-নীল ফিতে বাঁধা, ফুল গোঁজা, মোহন মাথাটির উপর তা এক মুকুট রচনা করে তুলেছে। সবকিছুতেই যেন মেয়েটির আগ্রহ, সবই তার কাছে অপরূপ, অভিনব... সুন্দর চোখ দুটি তার একটা থেকে আরেকটা বস্তুতে নিরবকাশে ধাবিত। মুগ্ধ না-হয়ে উপায় কী! মেলায় যে তার এই প্রথম! আঠার বছরের মেয়ে মেলায় এল এই প্রথম! ...তবে রাস্তায় লোকেদের কেউ জানত না বাপের সঙ্গে আসতে তাকে কত সাধ্য সাধনাকরতে হয়েছে। বাপ হয়তো তাকে আগেই নিয়ে আসত, কিন্তু পারেনি তার হিংসুটে সৎমায়ের জন্যে—বাপকে সে তেমনি অনায়াসেই চালায় যেমন বাপ এতদিন চালিয়ে এসেছে ওই বুড়ি মাদি ঘোড়াটাকে—দীর্ঘ সেবার প্রতিদানে আজ যেটিকে টেনে আনা হচ্ছে বিক্রি করে দেবার জন্যে। খাণ্ডারনি বৌ বটে... কিন্তু বলতে মনে ছিল না, মালপত্তরের চুড়োয় সে-ও এখানেই বসে আছে, গায়ে তার একটা সবুজ পশমের বাহারে ব্লাউজ, তাতে এর্মিন ফারের মতো কিছু পুচ্ছ সেলাই করা, তবে রঙটা শুধু লাল, পরনে দামি রঙচঙে ঘাগরা, দাবার ছকের মতো চৌখুপি কাটা, মাথায় ফুলকাটা সুতি টুপি, তাতে কেমন একটা বিশেষ রকমের ভারিক্কি ভাব ফুটে উঠেছে তার লালচে ভরাট মুখে, সে মুখে এমন একটা অপ্রীতিকর হিংস্রতা যে সকলেই তৎক্ষণাৎ তাদের সশঙ্ক দৃষ্টি ফিরিয়ে আনছিল মেয়েটির হাসিখুশি মুখে।

নিপারের উপনদী পসিয়োল দেখা গেছে ততক্ষণে, দূর থেকে ভেসে আসছিল ঠাণ্ডা আমেজ, উত্ত্যক্ত, বিকট গরমের পর সেটা বেশ জানান দিচ্ছিল। মাঠের এলোমেলো ছড়ানো পপলার আর বার্চ গাছের গাঢ়-কৃষ্ণ ও ফিকে-সবুজ পল্লবের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছিল শিখাময় শীতল ঝলক, নদী-সুন্দরী অনাবৃত করে দিচ্ছিল তার ঝকঝকে রুপোলি বুক, যার উপর ঝাঁকড়া হয়ে নুয়ে পড়েছে সবুজ গাছ-গাছালি। মদির এই মুহূর্তগুলোতে যখন তার অবিকল মুকুরে অমন নিখুঁত করে ধরা পড়ে তার গরবে দ্যুতিতে ভরা কপাল, তার লিলি-ধবল স্কন্ধ, তার পিঙ্গল মাথা থেকে তরঙ্গে নেমে আসা গাঢ় চুলের পটে আঁকা মর্মর গ্রীবা, যখন অবজ্ঞায় এক-একটা অলঙ্কার ছুড়ে ফেলে সে তুলে নেয় অন্য আর একটা আভরণ, শখের আর শেষ মেলে না—তখন এই খেয়ালিনী প্রায় প্রতি বছরেই তার পরিবেশটিকে বদলে নেয়, ধেয়ে যায় নতুন পথে, নতুন নতুন বিচিত্র দৃশ্যপটের হাট বসায়। সারি সারি মিল তাদের ভারি

www.pathagar.com

ভারি চাকায় ঢালাও তরঙ্গ তোলে, সজোরে নিক্ষেপ করে ফেনা ওঠায়, জলবিন্দু ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারপাশটা শব্দে ঢেকে দেয়। আমাদের পরিচিত যাত্রীদের নিয়ে গাড়িটা এই সময় সেতুর উপর গিয়ে উঠেছে, আর সমস্ত রূপ সমস্ত মহিমায় নদীটা তাদের সামনে পড়ে আছে একটা অখণ্ড কাচের মতো। আকাশ, নীল সবুজ বন, হাঁড়িকলসির গাড়ি, মিলগুলো—সবই দেখা যাচ্ছে উল্টো করে উপর দিকে পা করে দাঁড়িয়ে আছে বা চলছে, তলিয়ে যাচ্ছে না তার গভীর অপরূপ অতলে। দৃশ্যের সমারোহ দেখে আমাদের সুন্দরীটি অন্যমনস্ক হয়ে গেল, সমস্ত পথটা সে যে সূর্যমুখীর বিচি খেতে খেতে এসেছিল, সেটাও থেমে গেল তার, হঠাৎ কানে এল : 'সত্যি, মেয়ে বটে!' তাকিয়ে দেখল সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে ছেলেদের একটা ভিড়, তার মধ্যে একটা ছেলে কোমরে হাত রেখে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল বাহাদুরির চালে; সাজ-পোশাকটায় তার অন্যদের চেয়ে ঘটা বেশি, গায়ে সাদা রঙের আধা-চাপকান, মাথায় একটা ছাই রঙের রেশেতিলভকী টুপি; ছেলেটার রোদপোড়া কিন্তু মিষ্টি মুখটা নজর না-করে সুন্দরী পারল না, আর জ্বলজ্বলে চোখদুটো মনে হল যেন তার ভেতরটা ভেদ করে দেখছে; কথাটা সম্ভবত ওই বলেছে ভেবে চোখ নামিয়ে নিল সে।

'অপরূপ মেয়ে', চোখ না-সরিয়েই সাদা চাপকান পরা ছেলেটি বলে গেল, 'ওকে একবার চুমু খেতে পারলে আমি আমার সবকিছু দিয়ে দিতে রাজি। আর দেখ দেখ, একটা পেত্নি বসে আছে রে সামনে!'

হো হো হাসি উঠল চারদিক থেকে; কিন্তু ধীরগমন স্বামীটির অতিভূষিতা সহধর্মিনীর কাছে এরূপ সম্বোধন প্রীতিকর হল না; তার লালচে গাল আগুনে হয়ে উঠল, ফুর্তিবাজ ছোকরাটির উদ্দেশে বাছাই করা বর্ষণ ছাড়ল সে :

'গলায় গেরাস ঠেলে মর তুই হতভাগা মুটে! তোর বাপের মাথায় কলসি ভাঙুক! বরফে পা হড়কাক তোর বাপ, খ্রিস্টির শত্তুর! নরকে তোর দাড়ি পোড়াক ভূতেরা!'

'দেখ দিকি, গাল দিচ্ছে কেমন!' এরূপ অপ্রত্যাশিত সম্ভাষণের প্রবল উৎসাহে যেন-বা থমকে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে থেকে ছোকরাটি বলল, 'একশ বছুরে ডাইনি, এসব কথা বলতে বুড়ির জিভও টাটায় না।'

'একশ বছুরে!' কথাটা লুফে নিল আমাদের বর্ষীয়সী সুন্দরী, 'মুখপোড়া কোথাকার, যা মুখ ধুগে যা! অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার! তোর মাকে জানি না বটে, তবে এই বলে দিলাম, ওঁছা মাল তোর মা, ওঁছা মাল তো বাপ, ওঁছা মাল তোর চাচী-মাসি! সাত পুরুষের ওঁছা মাল! বলে কিনা একশ বছুরে! নাক টিপলে এখনো দুধ বেরোয়!'

এই সময় গাড়িটা সেতু থেকে নেমে যেতে শুরু করায় শেষ কথাগুলো শোনা গেল না; কিন্তু ছেলেটা মনে হল ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হতে দিতে চাইল না। বেশি কিছু না ভেবেই সে ছুড়ে মারল এক দলা কাদা নিয়ে। নিক্ষেপটা আশাতীত রকমের সফল হল : গিন্নির নতুন টুপিটা একেবারে কাদামাখা হয়ে গেল, আড্ডাবাজদের অট্টহাস্য উঠল আরো জোরে। শৌখিন নধরাঙ্গিনীটি রাগে ফুঁসল : কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে, ঝাল ঝাড়লে তার নির্দোষ সৎমেয়ে আর গজেন্দ্রগমন স্বামীটির ওপর, লোকটা অবশ্য এরূপ ঘটনায় বহুদিন অভ্যস্ত থাকায় অটুট মৌনাবলম্বন করে রইল এবং ক্রুদ্ধা স্ত্রীর চামুণ্ডা ভাষণ শুনে গেল নির্বিকার মুখে। তা সত্ত্বেও কিন্তু রমণীর অক্লান্ত জিহ্বা বকবক করেই চলল, যতক্ষণ-না তারা এসে পৌঁছল শহরের উপকণ্ঠে তাদের পুরনো স্যাঙাত কসাক ৎসিবুলিয়ার বাড়ির কাছাকাছি। বহুদিন না-দেখা স্যাঙাত-সইদের দেখা-সাক্ষাতে এই অপ্রীতিকর ঘটনাটার কথা কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের যাত্রীদের মাথা থেকে অপসৃত হল, আলাপ শুরু হল মেলা নিয়ে, দীর্ঘ পথের পর তারা বিশ্রাম নিল খানিকটা।

www.pathagar.com

দুই

বাপরে! মেলায় কী নেই বলো! চাকা, কাচ,
আলকাতরা, তামাক, চামড়া, পেঁয়াজ, কত
রকমের দোকান... তলিতে যদি তোমার
রুবল তিরিশেকও থাকে, তাহলেও গোটা
মেলাটা কিন্তু কেনা যাবে না।

মালোরুশীয় কমেডি থেকে

সম্ভবত কোথাও আপনারা পড়ন্ত জলপ্রপাতের শব্দ শুনে থাকবেন, যেখানে ভীত-শঙ্কিত চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে কলরোলে এবং অদ্ভুত অস্পষ্ট সব ধ্বনি ও গর্জনের একটা তাণ্ডব বাহিত হয়ে আসে। গ্রাম্য মেলায় যখন সমস্ত লোকে পরিণত হয় একটি প্রকাণ্ড দানবদেহে, চকে ময়দানে ও ভিড়াক্রান্ত রাস্তায় যার সমস্ত দেহটা নড়েচড়ে ওঠে, যখন সমস্ত লোকেই চেঁচায়, হাসে, ডাক ছাড়ে, তখনকার কলরোলেও কি ঠিক সেই এক অনুভূতি হয় না আপনাদের? গোলমাল, গালাগালি, হাম্বা হাম্বা, ব্যাব্যা, হাঁকডাক—সবই মিলেমিশে যায় একটা বিকট আলাপে। বলদ, বস্তা, বিচালি, বেদের দল, হাঁড়িকলসি, মেয়ে মাগী, পিঠে, টুপি—সবই জ্বলজ্বলে রঙচঙে, বেসুরো, গুচ্ছে গুচ্ছে আবর্তিত হচ্ছে চোখের সামনে। নানান কণ্ঠের কথায় ডুবে যায় সব কণ্ঠই, একটা শব্দকেও ধরা যায় না, বাঁচানো যায় না এই মহাবন্যা থেকে, একটি আওয়াজও পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। শোনা যায় কেবল মেলার চারদিক থেকে কিনিয়ে-বেচিয়ে-দের হাতে তালি মেরে দরাদরির নিষ্পত্তি। মালবোঝাই গাড়ির ভেঙে পড়ার শব্দ, লোহার ঝনঝন, মাটিতে ছুড়ে ফেলা কাঠ-তক্তার ধুপধাপ,—মাথা গোলমাল হয়ে যায়, বোঝা যায় না কোন দিকে ফিরব। আমাদের কৃষ্ণ-ভ্রু মেয়েটিকে নিয়ে যে চাষিটি এসেছিল, অনেক আগে থেকেই সে লোকজনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে চলেছে। কখনো এসে দাঁড়ায় একটা গাড়ির কাছে আর একটার কাছে গিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে, দরাদরি করে। আর মনটা তার ফেরে কেবলি দশ বস্তা গম আর মাদি ঘোড়াটাকে নিয়ে, যা সে নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্যে। তার মেয়ের মুখ দেখে বোঝা যায়, গম আর ময়দার গাড়ির কাছে ঘুরঘুর করাটা তার কাছে খুব প্রীতিকর ঠেকছিল না : তার ইচ্ছে হচ্ছিল সেই দিকে যায় যেখানে সামিয়ানার ছাউনির নিচে ফলাও করে ঝোলানো আছে লাল ফিতে, কানের দুল, টিনের আর তামার ক্রুশ, আর গলায় পরার চাকতি। তবে দেখবার মতো অনেক জিনিস এখানেও সে পেল, খুবই মজা লাগল তার এই দেখে যে একজন বেদে আর একজন চাষি দরাদরির নিষ্পত্তি করে এমন জোর হাতে-হাত তালি দিল যে ব্যথায় প্রায় কঁকিয়ে উঠল তারা, মাতাল এক ইহুদি ল্যাং মারল একটা মাগীকে; ঝগড়াটে দুই দোকানি মেয়ে পরস্পরের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছে, এক রুশি এক হাতে তার ছাগলে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে, আর অন্য হাতে ...হঠাৎ সে টের পেল কে যেন তার জামার নকসি হাতা ধরে টানল। তাকিয়ে দেখে সেই জ্বলজ্বলে চোখ, সাদা চাপকান পরা ছেলেটি। চমকে উঠল সে, এমন বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল যা কোনো সুখে কোনো দুঃখে কখনো হয়নি; ভারি আশ্চর্য আর অপরূপ বোধ হল তার, ভেবে পেল না নিজেকে নিয়ে কী করবে।

'ভয় নেই লক্ষ্মীটি, ভয় নেই!' তার হাত ধরে মৃদু স্বরে সে বলল, 'খারাপ কিছু বলব না!'

'হয়তো সত্যিই তুমি খারাপ কথা কিছু বলবে না', মনে মনে ভাবল মেয়েটি, 'কিন্তু কী আশ্চর্য... নিশ্চয় শয়তানের কাজ! মনে মনে তো জানাই আছে যে ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেবার জোর পাচ্ছি না যে।'

www.pathagar.com

চাষিটা তাকিয়ে দেখল, মেয়েকে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কানে এল একটা কথা 'গম'। যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হল কথাটায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে যোগ দিল সরবে আলাপরত দুই ব্যাপারির সঙ্গে, কোনো কিছুর দিকে মন দেবার আর ফুরসুত হল না। ব্যাপারিরা গম নিয়ে যে আলাপ করছিল, সেটা এই :

তিন

দেখেছ তো, লোকটা কেমন?
খুব বেশি নেই এ সংসারে।
ভোদকা টানে জলের মতন!
কৎলিয়ারেভস্কি, 'এনেইদা'

'তুমি তাহলে বলছ ভায়া, আমাদের গমের গতিক খারাপ?' যে লোকটা বলছিল তার চেহারাটা সফরে বেরুনো শহরবাসীর মতো, পরনে রঙচঙে মোটা সুতিকাপড়ের ঢোলা ট্রাউজার, তাতে আলকাতরা আর চর্বির দাগ। যাকে বলছিল তার পরনে জায়গায় জায়গায় তালি-মারা একটা নীল আধাচাপকান, কপালে একটা ফোলা।

'সে আর বলতে : এক মাপ গমও যদি বিক্রি হয় তবে গলায় দড়ি বেঁধে আমায় সসেজ ঝোলানো করে এই গাছটায় ঝুলিয়ে দিয়ো।'

'কী যে বলছ, ভায়া! আমরা ছাড়া গম তো আর কেউ আনেনি।' ঢোলা ট্রাউজার পরা লোকটি আপত্তি করল।

আমাদের সুন্দরীর বাপটি দুই ব্যাপারির এ আলাপে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি, মনে মনে সে ভাবল, 'হুঁ হুঁ, যা মন চায় বলে যাও। আমার কাছে কিন্তু দশ বস্তা মজুদ।'

'কথাটা হল এই : ভুতুড়ে কাণ্ড যদি কোথাও লাগে তাহলে ভালো কিছুর আশা বৃথা, তোমার এই নিরন্ন মস্কালদের কাছ থেকে যেমন ভালো কিচ্ছু কখনো মেলে না।' কপাল-ফোলা লোকটা বললে খুব অর্থময় একটা ভাব করে।

'কিসের ভুতুড়ে কাণ্ড?' ঢোলা ট্রাউজার পরা লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'লোকে কী বলাবলি করছে শোনোনি?' বিষণ্ন চোখের একটা তির্যক দৃষ্টিপাত করে বলল কপাল-ফুলো।

'কী বলছে!'

'ওই কী কী নিয়েই থাকো! আমাদের ছোটো হাকিম, ঈশ্বর করুন, জমিদারবাড়িতে মদ টেনে মুখ মোছারও যেন কপাল না-হয় লোকটার, এই ছোটো হাকিম মেলার জায়গা বরাদ্দ করেছে একটা ভুতুড়ে এলাকায়, এখানে মরে গেলেও গম বিকবে না। ওই পুরনো ভেঙে পড়া চালাটা দেখছ তো, টিলার নিচে দাঁড়িয়ে আছে?' (এই সময় আমাদের সুন্দরীটির কৌতূহলী পিতা আরো কাছে সরে এসে একেবারে মনোযোগের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়াল)। 'ওই চালাটাতেই চলে সব ভুতুড়ে কাণ্ড। এ জায়গাটায় কোনো মেলাই ভালোয় ভালোয় পেরোয়নি। কাল আমাদের ভোলোস্তের সেরেস্তাদার রাত করে যাচ্ছিল, হঠাৎ কিনা জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা শুয়োরের মুখ, এমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে যে সেরেস্তাদারের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আরো দেখো আবার লাল কোর্তা ফের-না আসে।'

'লাল কোর্তা আবার কী?'

শুনেই আমাদের মনোযোগী শ্রোতাটির লোম খাড়া হয়ে উঠল। সভয়ে পেছন দিকে তাকাতেই দেখে তার মেয়েটি শান্তভাবে ছেলেটির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে,

www.pathagar.com

মধুর কী এক কাহিনী শোনাচ্ছে পরস্পরকে, আর তাতেই যেন ভুলে গেছে দুনিয়ার সবকিছু। এতে তার ভয় দূর হয়ে আগের নিশ্চিন্ত ভাবটা ফিরে এল।

'বাহবা, বাহবা ভায়া! জড়িয়ে ধরার কায়দা আছে দেখছি! আর আমি আমার আগের বৌ খভেসকাকে জড়িয়ে ধরতে শিখি কেবল বিয়ের চারদিন পরে। তা-ও আমার স্যাঙাতের দৌলতে, সেই বুঝিয়ে-শুনিয়ে দেয়।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল তার প্রেয়সীর বাপটি বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নয়, মনে মনে ভাবতে লাগল কী করে তাকে পক্ষে টানা যায়।

'তুমি বাপু লোক ভালো বটে, তবে আমায় চিনতে পারলে না, আমি তোমায় দেখেই চিনেছিলাম।'

'তা চিনতে পারো।'

'যদি চাও তো দেখো তোমার নাম, ধাম সবকিছু বলে দিচ্ছি : নাম তোমার সলোপি চেরেভিক।'

'তাই বটে গো, সলোপি চেরেভিক।'

'আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো তো, চিনতে পারছ না।'

'উঁহুঁ, চিনতে পারছি না। মনে কিছু করো না বাপু, জীবনে যত চাঁদবদন দেখেছি, সবাইকে মনে রাখতে পারে কেবল শয়তানেই!'

'গলোপুপেঙ্কোর ছেলেকে মনে নেই!'

'তুমি তাহলে অখ্রিমভের ছেলে?'

'তা ছাড়া কে? ভূত তো আর নই।'

অমনি টুপি খুলে চুম্বন বিনিময় হল। আমাদের গলোপুপেঙ্কোর ব্যাটা এক মুহূর্ত নষ্ট না করেই তার নতুন পাওয়া পূর্বপরিচিতের ওপর আক্রমণ চালাবে ঠিক করল।

বলল, 'বলেছিলাম কী সলোপি, দেখছই তো, আমি আর তোমার মেয়ে, দু'জন দু'জনকে এমন ভালোবেসেছি যে সারা জীবনই একসঙ্গে কাটাবার ইচ্ছে।'

মেয়ের দিকে ফিরে হেসে বললে চেরেভিক, 'তা পারাস্কা, হয়তো তাই হবে আর কী, তোমরা দুটিতে, সেই যে বলে, এই মাঠেই চরবে। তাহলে কী? কথা পাকা? তাহলে আমার নতুন জামাই, মিষ্টি মুখ করিয়ে দাও!'

সুতরাং তিনজনেই গিয়ে হাজির হল সামিয়ানার তলে মেলার বিখ্যাত রেস্তোরাঁয়, এটির মালিক একজন ইহুদিনী, নানা চেহারা ও নানা আকারের অসংখ্য শিশি, বোতল, সুরাপাত্রের এক অক্ষৌহিণীতে সুসজ্জিত।

'সাবাস জামাই, এই জন্যেই ভালোবাসি!' বলল চেরেভিক একটু নেশার ঝোঁকে, যখন দেখল তার ভাবী জামাই মগে সের দেড়েক মদ ঢেলে এক নিশ্বাসে সাবাড় করে মগটাকে ভেঙে গুঁড়ো করল, 'কী বলিস, পারাস্কা? তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়েছি দেখ। কেমন বাহাদুরের মতো ভোদকা টানে দেখেছিস!'

হাসতে হাসতে টলতে টলতে মেয়েকে নিয়ে যে যাত্রা করল নিজের গাড়ির দিকে, আর আমাদের ছেলেটি গেল মনিহারি দোকানগুলোর সারির দিকে, পলতাভা গুবের্নিয়ায় বিখ্যাত দুই শহর, গাদিয়াচ আর মিরগরোদ থেকেও ব্যাপারিরা আসে এখানে, খোঁজ করতে লাগল শৌখিন তামা বাঁধাই কাঠের পাইপ, লাল জমির ওপর ফুল তোলা মাথার রুমাল আর টুপি—শ্বশুর এবং অন্যান্য যাদের দেওয়া দরকার তাদের জন্যে বিয়ের প্রণামী।

www.pathagar.com

চার

স্বামী যত চাক এইটে,
বউ যদি চায় ওইটে,
বুঝে নাও কিবা ঘটবে...
কর্ণলিয়ারেভস্কি

'শোন বউ, মেয়ের বর পেয়েছি!'

'দেখো একবার, বর খোঁজার সময় বটে! হাঁদা, হাঁদা একেবারে! চিরকাল হাঁদাই থেকে যাবি, এই তো কপালে লেখা! এই সময়ে ভালো মানুষে বর খুঁজতে বেরিয়েছে এ তুই কবে দেখেছিস, কবে শুনেছিস? কোথায় গমটা খালাস করার কথা ভাববে, তার বদলে দেখো কাণ্ড; আর বরও এখানে জুটবে ভালোই! কোথাকার ভুখা নাঙ্গা কাঙ্গাল হবে একটা নিশ্চয়।'

'কী যে বলিস গো, মোটেই তা নয়! ছেলেটি কেমন একবার দেখলে পারতিস! ওর ওই চাপকানটারই দাম হবে তোর সবুজ জামা আর লাল বুটজোড়ার চেয়ে বেশি। আর মদ টানতে পারে কেমন, শয়তানের দিব্যি, সারা জীবনেও কখনো দেখিনি যে, ছেলে-ছোকরা বয়স, এক টানে সের দেড়েক মদ শেষ করে, মুখ এতটুকু কোঁচকায় না।'

'তা তো বটেই, মেদো মাতাল ভবঘুরে হলেই ঠিক ওর মনের মতন। বাজি রেখে বলতে পারি, এ ওই হারামজাদাটা, সাঁকোর উপর যে আমাদের সঙ্গে মস্কারা লাগিয়েছিল। সামনে একবার পেলে হয়, টের পাইয়ে ছাড়ব।'

'কী বলছিস গো হিভ্রিয়া, নয় সেইটেই হল, কিন্তু হারামজাদা হবে কেন?'

'শোনো কথা, হারামজাদা হবে কেন! ওরে মাথামোটা! শোনো একবার হারামজাদা হবে কেন? মিলের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন তোর হাঁদা গঙ্গারাম চোখদুটো ছিল কোথায়? ওর নস্যিমাখা নাকের ডগায় বৌকে লোকে অপমান করে যায়, আর ওর তাতে বয়েই গেল!'

'যাই বল, আমার তো খারাপ কিছু মনে হয় না; কী চমৎকার ছোকরা! তোর পোড়ার মুখে গোবর ছুড়ে মেরেছিল, তা ছাড়া তো কিছু নয়।'

'বটে, আমার কথা বলাও চলবে না দেখছি! এর মানে কী? কী হল তোর? কিছু বেচা হতে না-হতেই দেখছি মদ টেনে এসেছিল...'

এই সময় চেরেভিক নিজেই টের পেলে যে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মুহূর্তেই দুই হাতে মাথা ঢাকল সে, নিশ্চয় অনুমান করেছিল যে তার ক্রুদ্ধা সহধর্মিণী স্ত্রীসুলভ নখরে তার চুল চেপে ধরতে বিলম্ব করবে না।

'চুলোয় যাক গে! বিয়ের দফা শেষ!' বৌয়ের চামুণ্ডা হামলার সামনে পিছিয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবে যে, 'কারণ নেই, কৈফিয়ৎ নেই, না করে দিতে হবে ভালো ছেলেটাকে। হায় ঈশ্বর, আমাদের পাপীদের ওপর কেন এই অভিশাপ। এমনিতেই তো কত ওঁছা মালে দুনিয়া ভরা, তার ওপর আবার বৌ কেন গড়লে ঈশ্বর।'

পাঁচ

ম্যাপ্‌ল গাছ তুই হেলিস না,
সবুজ যে তোর ফুরোয়নি;
কসাক ভাই, তুই দমিস না,
বয়স যে তোর বুড়োয়নি।
মালোরুশীয় গান

www.pathagar.com

সাদা চাপকান পরা ছেলেটি তার গাড়ির উপর বসে আনমনে তাকিয়েছিল চারপাশের একটানা কোলাহলমুখর জনতার দিকে। শ্রান্ত সূর্য সকাল দুপুর শান্তভাবে জ্বলে জ্বলে এখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে; নিভন্ত দিন আরক্ত হয়ে উঠেছে মনোহর জ্বলজ্বলে আভায়। সাদা সাদা তাঁবু আর সামিয়ানার মাথাগুলো চোখ ধাঁধিয়ে ঝক্‌ঝক্ করছে, তাদের ওপর দুর্লক্ষ একটা আগুনে-গোলাপি আলো। বিক্রির জন্যে গাদা করে রাখা জানলার শার্সিগুলো জ্বলছে; শুঁড়ি-বৌদের দোকানের টেবিলে সবুজ সুরাদার ও পেয়ালাগুলো ঝলক দিচ্ছে শিখার মতো। তরমুজ, ফুটি আর কুমড়োর টিপগুলো মনে হয় যেন সোনা আর ময়লাটে তামা থেকে ঢালাই করা। কথাবার্তা এখন স্পষ্টতই হয়ে উঠেছে স্বল্পতর ও ভাঙাভাঙা, ফড়িয়া, চাষি আর বেদেদের জিভ চলছে ধীরে ধীরে, আলস্যে। কোথাও কোথাও আগুন জ্বলতে শুরু করেছে, মাংস রান্নার উপাদেয় ভাপ বয়ে আসছে শান্ত হয়ে আসা রাস্তায়।

'মন ভার কেন রে গ্রিৎস্কো?' রোদপোড়া এক লম্বা বেদে আমাদের ছোকরাটির কাঁধে চাপড় মেরে বলল, 'কী বলিস, কুড়ি দিচ্ছি, তোর বলদজোড়া বেচে দে!'

'তোর কেবল ঐ বলদ আর বলদ। তোদের জাতটার নজরই শুধু লাভের দিকে। ভালো লোকদের ঠকিয়ে বেড়াস।'

'বাপরে, একেবারে ব্রহ্মদত্যি! তিরিক্ষি মেজাজ তো আর অমনি অমনি নয়। কী রে, কনে-টনে ঘাড়ে চাপিয়েছিস বলেই মন খারাপ নাকি?'

'উঁহুঁ, আমার সে স্বভাব নয়; কথার খেলাপ আমি করি না; যদি কিছু করি তো করি চির জম্মের মতো। আর ঐ দেখ-না, ধেড়ে ছুঁচো চেরেভিকটার বোঝাই যাচ্ছে বিবেকও নেই, ট্যাঁকে কড়িও নেই; হ্যাঁ বলে আবার কথা ঘুরুলে... তবে ওকে আর দোষ দেব কী, একেবারে মাথামোটা। এ সবই ওই বুড়ি ডাইনিটার কাণ্ড, সেতুর উপর যেটাকে আমরা ছেলে-ছোকরা সবাই খুব এক চোট গালমন্দ করেছিলাম! ইস্, যদি জার বা কোনো হোমরাচোমরা জমিদার হতাম তো মাগীন্যাওটা সব ক'টা আহাম্মককে ফাঁসিতে ঝোলাতাম...'

'আর যদি তোর জন্যে পারাস্কাকে জুটিয়ে দিতে পারি তাহলে কুড়ি রুবলে ছেড়ে দিবি বলদজোড়া?'

বিমূঢ়ভাবে গ্রিৎস্কো তাকাল তার দিকে। বেদেটার ময়লাটে মুখখানায় কী-একটা যেন ছিল যা কেমন হিংস্র, বিষাক্ত, নীচ এবং সেই সঙ্গেই দর্পিত : তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই আশ্চর্য মনটা ভেতরে ভেতরে মহৎ গুণে টগবগ করছে, তবে পৃথিবীতে তার একটি মাত্র পুরস্কারই বর্তমান—ফাঁসিমঞ্চ। নাক আর ছুঁচলো থুঁতনির মাঝখানে একেবারে বসে যাওয়া মুখটা, তাতে অবিরাম একটা বাঁকা হাসি, অনতিবৃহৎ চোখ কিন্তু আগুনের মতো জীবন্ত, মুখের ওপর ফন্দিফিকিরের অবিরত বিদ্যুৎঝলক, এ সবই যেন সে তখন যে বিশেষ রকমের অদ্ভুত একটা পোশাক পরেছিল তার সঙ্গে খুবই মানানসই। তার গাঢ় বাদামি কাফতানটা দেখে মনে হচ্ছিল যে তা ছুঁলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়বে, কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে যে ঝাঁকড়া কালো চুল, তার অনাবৃত রোদপোড়া পায়ের নাগরা—এ সবই যেন তার গা থেকে গজিয়েছে, তার স্বভাবেরই একটা অঙ্গ।

'যদি ধোঁকা না-দিস তাহলে কুড়ি নয়, পনেরোতেই ছেড়ে দেব।' বেদেটার মুখ থেকে তার সন্ধানী দৃষ্টি না-সরিয়েই বলল ছেলেটা।

'পনেরোতেই? ভালো কথা। তবে দেখিস, মনে রাখিস পনেরো! এই যে আগাম রইল পাঁচ রুবল!'

'কিন্তু যদি ধোঁকা দিস?'

'ধোঁকা দিলে ওটা তোরই রইল!'

www.pathagar.com

'বেশ, তাহলে হাতে হাত!'
'হাতে হাত!'

ছয়

এই সর্বনাশ, রোমান আসছে,
এসেই আমার হাড় ভাঙবে
আর আপনি জমিদারবাবু হোন
আপনিও ছাড়ান পাবেন না।
মালোরুশীয় কমেডি থেকে

'এই দিক দিয়ে আফানাসি ইভানভিচ, বেড়াটা এই দিকে নিচু, পা তুলুন, ভয় নেই, আমার বোকামণিটি গেছে তার স্যাঙাতের সঙ্গে সারারাতের মতো, গাড়ির নিচে ঘুমোবে, মস্কালরা কিছু যাতে মেরে না দেয়।'

চেরেভিকের চামুণ্ডা সহধর্মিণী এই বলেই মিষ্টি সুরে সাহস দিল পাদ্রিপুত্রকে, বেড়ার কাছে ভয়ে ভয়ে ঘুরঘুর করছিল সে, এবার বেড়ার উপর উঠে একটা দীর্ঘ ভয়ঙ্কর প্রেতমূর্তির মতো অনেকক্ষণ অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দিয়ে আন্দাজ করল কোথায় লাফ দেওয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত ধপাস করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঘাসপাতার মধ্যে।

'কী সর্বনাশ! লাগেনি তো, ঈশ্বর রক্ষা করুন, হাড়গোড় ভাঙেনি তো?' থতমত খেয়ে বলল আমাদের সশঙ্কিতা হিভ্রিয়া।

'আস্তে! কিছু না, কিছু হয়নি গো লক্ষ্মীমণি, ভাদ্রোনিয়া নিকিফরভনা!' পায়ের উপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ব্যথাতুর অস্ফুট কণ্ঠে বলল পাদ্রিপুত্র, 'শুধু ওই আমাদের স্বর্গগত বড় পাদ্রি যা বলতেন, এই সর্পসদৃশ্য লতা বিছুটির কামড়টুকু ছাড়া।'

'চলুন চলুন এবার ঘরে যাই। সেখানে কেউ নেই। আমার তো ভাবনা হয়েছিল আফানাসি ইভানভিচ, হয়তো আপনার পিত্তিদোষ কি পেটের অসুখ শুরু হয়েছে। সেই যে দেখা নেই, তো দেখাই নেই। কেমন আছেন গো? শুনেছি, আপনার পিতামশাই এটা-ওটা অনেক পেয়েছেন!'

'বিশেষ কিছু নয় হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা, বাবা সর্বসমেত এই গোটা পার্বণটার জন্যে পেয়েছে পনেরো বস্তা গম, বস্তাচারেক মিলেট, শতখানেক রুটি, আর মুরগি যা পেয়েছেন তা গুনে দেখলে পঞ্চাশও হবে না, আর ডিমগুলোর অধিকাংশই তো খারাপ। কিন্তু সত্যিকারের মধুর দক্ষিণা, বলা যেতে পারে, কেবল আপনার কাছ থেকেই মিলবে হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা!' সস্নেহে তাকাতে তাকাতে আরো কাছ ঘেঁসে এসে বলল পাদ্রিপুত্র।

'এই নিন আপনার দক্ষিণা, আফানাসি ইভানভিচ!' টেবিলের উপর কয়েকটা পাত্র রেখে সে বলল। ন্যাকামি করে ব্লাউজের বোতাম লাগাতে লাগল এমনভাবে যেন এতক্ষণ যে সেটা খোলা ছিল তা ঠিক ইচ্ছে করেই নয়, 'ছানার পিঠে, ময়দার পুলি, কেক, সুজি!'

'বাজি রেখে বলতে পারি ইভ-কন্যাদের মধ্যে সবার সেরা নিপুণ যার হাত, সেই হাতে বানানো!' এক হাতে সুজি নিয়ে অন্য হাত পিঠের দিকে বাড়িয়ে বলল পাদ্রিপুত্র, 'তাহলেও হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা, মন আমার লোলুপ হয়ে আছে আপনার সমস্ত পিঠে পুলির চেয়েও মিষ্টি একটি খাদ্যের জন্যে।'

'কিন্তু আমি তো জানি না, আফানাসি ইভানভিচ, আর কোন খাদ্যের ইচ্ছে আপনার!' না-বোঝার ভান করে বলল আমাদের পুরুষ্টু সুন্দরী।

www.pathagar.com

'বলাই বাহুল্য, আমাদের অতুলনীয়া হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা, আপনার প্রেম!' এক হাতে পিঠে এবং অন্য হাতে তার প্রশস্ত কোমর জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল পাদ্রিপুত্র।

'ঈশ্বর জানেন, আফানাসি ইভানভিচ, কী যে আপনার মতলব!' সলজ্জে চোখ নামিয়ে বলল হিভ্রিয়া, 'এরপর আবার চুমু খেতে চাইবেন হয়তো, কে জানে!'

'কথা যখন উঠল তখন নিজের সম্পর্কেই শোনাই', বলে চলল পাদ্রিপুত্র, 'আমার জীবনে, সত্যি বলতে কী আমার শাস্ত্রশিক্ষার সময়েই, একেবারে যেন এই সেদিনের ঘটনা বলে মনে পড়ছে...'

এই সময় আঙিনায় কুকুরের ডাক আর ফটকে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। হিভ্রিয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়েই ফিরে এল একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে।

'আফানাসি ইভানভিচ, আমাদের দফা শেষ! দরজায় ঘা দিচ্ছে একদল লোক, মনে হল যেন আমাদের স্যাঙাতের গলাও শুনলাম...'

পাদ্রিপুত্রের গলায় পিঠে আটকে গেল...চোখ ড্যাবডেবে হয়ে উঠল তার, যেন পরপার থেকে এইমাত্র কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তাকে দর্শন দিতে।

'উঠে পড়ুন এইখানে!' চেঁচিয়ে উঠল ভীতা হিভ্রিয়া, ঠিক ছাদের নিচে দুই কড়িকাঠের উপর পাতা যে তক্তাটার উপর যত সাংসারিক টুকিটাকি ঢিপ করা ছিল সেইখানটা দেখিয়ে দিল সে।

বিপদে সাহসী হয়ে উঠল আমাদের নায়ক। খানিকটা কী ভেবে নিয়ে সে গিয়ে চাপল চুল্লির উপর, তারপর সেখান থেকে সেঁধল তক্তাটার উপরে আর দিশেহারা হয়ে হিভ্রিয়া ছুটল ফটকের দিকে, কেননা করাঘাত সেখানে আরো প্রবল ও অধীর হয়ে উঠেছিল।

সাত

আশ্চর্য কাণ্ড, হুজুর!

মালোরুশীয় কমেডি থেকে

মেলায় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে : চতুর্দিকে গুজব শোনা গেল পশরাপাতির মাঝখানে কোথায় যেন লাল কোর্তাকে দেখা গেছে। রুটিওয়ালি এক বুড়ির কাছে শয়তান দেখা দিয়েছে শুয়োরের রূপে, অনবরত গাড়িগুলোর উপর সে শুয়োর ঝুঁকে ঝুঁকে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ইতোমধ্যেই নিঝুম হয়ে আসা এলাকাটার সর্বপ্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল কথাটা এবং যদিও রুটিওয়ালির চলন্ত দোকানটা ছিল শুঁড়িখানার পাশেই এবং সারাদিন অকারণেই সে সেলাম ঠুকছিল সবাইকে, টলটলায়মান পা দিয়ে সে তার মুখরোচক রুটিগুলোর মতোই সব নানা মূর্তি আঁকছিল মাটিতে, তাহলেও কথাটা অবিশ্বাস করা অপরাধ বলেই মনে হল সবার। এর সঙ্গে যুক্ত হল ভাঙা চালার কাছে সেরেস্তাদারের দেখা অবাক কাণ্ডটার অতিরঞ্জিত সংবাদ, ফলে রাতের দিকে সবাই পরস্পর গা ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকাই শ্রেয় বোধ করল; মনের শান্তি গেল চুলোয়; ভয়ে চোখের পাতা বন্ধ করার সাহস হল না কারো। যাদের বিশেষ বীরত্ব ছিল না, এবং আগেই কোনো ঘরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা রেখেছিল, তারা চলতে শুরু করল ঘরমুখো। এই শেষের দলে ছিল চেরেভিক, আর তার মেয়ে ও স্যাঙাত, তাদের সঙ্গে অনাহূত অভ্যাগত হিসেবে যারা জুটে গিয়েছিল তারাই ওই করাঘাত শুরু করে যাতে অমন ভয় পেয়ে যায় আমাদের হিভ্রিয়া। স্যাঙাত ইতোমধ্যেই একটু টং হয়েছিল। সেটা বোঝা যায় এই দেখে যে সে বাড়িটা ঠাহর করার আগে দু'বার তার সামনে দিয়েই গাড়ি হাঁকায়। অভ্যাগতরাও বেশ ফুর্তির মেজাজেই ছিল, গৃহস্বামীর আগেই তারা অসঙ্কোচে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সবাই যখন ঘরের চারপাশ ভরে ফেলেছে ততক্ষণে হিভ্রিয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছে শরশয্যার মতো।

www.pathagar.com

'কী হল স্যাঙাত-বৌ!' ঘরে ঢুকে বলল স্যাঙাত, 'তোর বুঝি এখনো কম্পজ্বর চলছে?'

'হ্যাঁ গো, শরীর ভালো নেই', ছাদের তলের তক্তাটার দিকে অস্বস্তির দৃষ্টিপাত করে বলল হিব্রিয়া।

'যা বৌ, গাড়ি থেকে একটা বোতল নিয়ে আয়!' স্যাঙাত বলল তার সহগামিনী বৌকে, 'ভালো মানুষদের সঙ্গে ওটা শেষ করা যাক। হতভাগা মাগীগুলো আমাদের এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে বলতেও লজ্জা হয়। হায়! ঈশ্বরের যত বাজে হুজুগে আমরা সব চলে এলাম ভায়া!' মেটে পেয়ালাটা শেষ করে সে বলে চলল, 'নতুন একটা টুপি বাজি—এ নিশ্চয় ওই মাগীগুলোর ফন্দি, আমাদের নিয়ে মজা করার ছল। ধর যদি শয়তানই হয়, কী হল! শয়তান আবার কে? ঝাঁটা মারি তার মাথায়! যদি এক্ষুণি ও এসে, ধরো, আমার সামনেই দাঁড়ায়, তাহলে ঠিক ওর নাকের ওপর যদি একটা গাঁট্টা না-বসাই তো আমি কুত্তার বাচ্চা!'

'তাহলে অমন হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেছিলি যে,' বলল অভ্যাগতদের একজন, মাথায় সে সবচেয়ে লম্বা, সব সময়ই সাহসের ভাব দেখাতে চায়।

'আমি? ... বলিস কী, স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?'

অভ্যাগতরা হেসে উঠল। বাক্যবীরটির মুখেও ফুটে উঠল তুষ্টির হাসি।

'এখন আর ওর ফ্যাকাশে হবার জো কোথায়!' টিপ্পনী কাটলে আরেক জন।

'গাল ওর দেখ না পপি ফুলের মতো লাল। এখন আর ও ৎসিবুলিয়া নয় একেবারে লাল বিট, বলতে কি একেবারে ওই খোদ লাল কোর্তার মতো; লোকে যার ভয়ে মরছে।'

বোতলটা টেবিল ঘুরতেই অতিথিরা আগের চেয়েও হাসিখুশি হয়ে উঠল। লাল কোর্তার ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই আমাদের চেরেভিককে মনঃপীড়া দিচ্ছিল, তার সদা-কৌতূহলী মনটা মুহূর্তের জন্যে শান্তি পাচ্ছিল না। স্যাঙাতকে সে বলল, 'নে বাপু স্যাঙাত, দয়া করে ব্যাপারটা কী বলত। তোর এই লাল কোর্তার কাহিনীটা জিজ্ঞেস করে করেও কিছুতেই আর শোনা হয়ে উঠল না।'

'হেঁ হেঁ, স্যাঙাত! ওসব কথা রাতে বলা ঠিক নয়। তবে তোর জন্যে আর এই ভালো লোকদের জন্যে' (কথাটা সে বলল অভ্যাগতদের উদ্দেশ করে), দেখছি এরা সকলেই তোরই মতো ভুতুড়ে কাণ্ডটা যখন শুনতে চাইছ, তখন তাই হোক। শোন তবে।'

এই বলে সে কাঁধ চুলকিয়ে, আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে দুই হাত টেবিলে রেখে শুরু করল:

'একবার, ঈশ্বর জানেন কী একটা দোষ করায় একটা শয়তানকে নরক থেকে খেদিয়ে দেওয়া হয়।'

'সে কী স্যাঙাত', বাধা দিল চেরেভিক, 'নরক থেকে শয়তানকে ভাগিয়ে দিল, এটা হয় কী করে।'

'ভাগিয়ে দিল তো আমি তার কী করব স্যাঙাত, ভাগিয়ে দিল লোকে যেমন করে কুকুর খেদায় বাড়ি থেকে। হয়তো কোনো একটা ভালো কাজ-টাজ করতে চেয়েছিল আর কী, বাস দরজা দেখিয়ে দিল। বেচারি শয়তানটার এখন মন কেমন করে, হাপিত্যেশ করে নরকের জন্যে, গলায় দড়ি দেবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু কী আর করে? মনের দুঃখে মদ ধরল। ডেরা পাতল ওই চালাটায়, যেটা ভেঙে পড়েছে ওই টিলার নিচে, তুই দেখেছিস, কোনো ভালো মানুষ এখন আর ওর সামনে ক্রুশের পবিত্র চিহ্ন না-দিয়ে যাবে না, শয়তানটাও এমন নেশাখোর হয়ে উঠেছে যে কোনো ছেলে-ছোকরার মধ্যেও তেমনি দেখবে না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ওই এক কাজ—শুঁড়িখানায় বসে বসে মদ গেলা!...'

এইখানটায় আমাদের বিচারপ্রবণ চেরেভিক ফের কাহিনীকারকে থামাল :

www.pathagar.com

'তুই যে কী বলছিস স্যাঙাত, ঈশ্বর জানেন! শয়তানকে শুঁড়িখানায় ঢুকতে দিল যে বড়! সেটা হয় কী করে? যতই হোক, ঈশ্বর রক্ষা করুন, শয়তানের মাথায় তো শিঙ আর হাতের থাবায় বড় বড় নখ রয়েছে যে।'

'আরে ঐ তো মজা, মাথায় যে ছিল টুপি, আর হাতে দস্তানা। কে ওকে তখন চিনবে? মদ টানে আর টানে, শেষ পর্যন্ত পকেটে যা ছিল সবই খেয়ে উড়িয়ে দিল। শুঁড়ি অনেকদিন বিশ্বাস করে তাকে মদ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দেয় না। তখন শয়তানকে তার লাল কোর্তাটা বাঁধা রাখতে হল ইহুদিটার কাছে, সরোচিনেৎস মেলায় তখন যে শুঁড়িখানাটা চালাত, বাঁধা রাখল দামের তিন ভাগের এক ভাগেও নয়। বলে, 'দেখিস ইহুদি, কোর্তাটা ছাড়াতে আসব ঠিক এক বছর পরে, সামলে রাখিস!' তারপর উধাও, একেবারে বেপাত্তা। কোর্তাটাকে ভালো করে দেখল ইহুদি, কাপড়টা এমন যে তোমার মিরগরোদেও তা মিলবে না। আর লাল রঙ জ্বলছে কী, যেন আগুন, চোখ আর ফেরানো যায় না! বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার আর তর সইল না ইহুদিটার। মাথা চুলকিয়ে-টুলকিয়ে শেষ পর্যন্ত এক যাত্রী জমিদারবাবুর কাছে কম করে পঞ্চাশ রুবলে ছেড়ে দিল। মেয়াদের কথাটা ইহুদি একেবারে ভুলে বসেছিল। কিন্তু একদিন সন্ধেয় কে একটা লোক এসে হাজির। বলে, 'দে ইহুদি আমার কোর্তা।' ইহুদি প্রথমটা চিনতে পারেনি, পরে ভালো করে ঠাহর করার পর ভাব করতে লাগল যেন জীবনেও তাকে দেখেনি। 'কিসের কোর্তা? কোনো কোর্তা আমার কাছে নেই। তোর কোর্তার বিন্দুবিসর্গ আমি কিছু জানি না।' শয়তানটা খানিক তাকিয়ে থেকে চলে গেল। তবে সন্ধ্যায়, ইহুদি যখন তার ঝাঁপ বন্ধ করে, পয়সাকড়ি গুনে-গেঁথে সিন্দুকে তুলে, একটা চাদর টেনে শুয়ে তার ওই ইহুদি ধর্মের প্রার্থনা শুরু করেছে, হঠাৎ শোনে খচমচ শব্দ, তাকিয়ে দেখে, সবকটি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে শুয়োরের মুখ...'

এই সময় সত্যি সত্যিই কী একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, হুবহু একেবারে শুয়োরের ঘোঁৎঘোঁতানির মতো; সবাই ফ্যাকাশে হয়ে উঠল... গল্পকারের মুখে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'কী ওটা?' ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল চেরেভিক।

'ও কিছু নয়!...' সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে বলল তার স্যাঙাত।

'স্-স্-স্!' সাড়া দিল অভ্যাগতদের একজন।

'তুই বললি কিছু?'

'উঁহু!'

'তবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল কে?'

'ঈশ্বর জানেন, এমন আঁৎকে উঠবার কী আছে! কেউই নেই!'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল সবাই, কোণের দিকে ঘেঁসতে লাগল। হিদ্রিয়ার একেবারে জীবন্মৃত অবস্থা।

গলা উঁচিয়ে সে বলল, 'ছি, ছি, তোমরা সব মাগীরও অধম! এই তোমরা কসাক, এই তোমরা মরদ! হাতে তকলি নিয়ে তোমাদের সুতো কাটতে বসা উচিত। কেউ হয়তো, ঈশ্বর মাপ করুন, মানে কারো হয়তো তক্তপোষ-টোষ হয়তো একটু ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠেছে অমনি সবাই তোমরা ভেড়ার পালের মতো হুড়োহুড়ি লাগিয়েছ!'

এতে আমাদের বীরপুরুষদের লজ্জা বোধ হল, একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল সবাই, মগে চুমুক দিয়ে স্যাঙাত ফের গল্পের সূত্র তুলে ধরল :

'ইহুদি তো মূর্ছা গেল। শুয়োরগুলো কিন্তু রণপায়ের মতো লম্বা লম্বা পায়ে জানলা বেয়ে উঠে তোমার তিন বিনুনির চাবুক দিয়ে এক দণ্ডেই জাগিয়ে তুলল তাকে, ইহুদি তো

www.pathagar.com

লাফাতে শুরু করল তোমার ওই কড়িকাঠগুলোও ছাড়িয়ে। পায়ে লুটিয়ে পড়ল ইহুদি, সবকিছু কবুল করল ... তবে কোর্তা তো আর সহজে মিলবার নয়। রাস্তায় জমিদারবাবুর ওপর ডাকাতি করে কোনো এক বেদে, ব্যাপারি-মেয়ের কাছে বেচে দেয়। ব্যাপারি-মেয়ে সেটা ফের নিয়ে আসে সরোচিনেৎস মেলায়, কিন্তু সেই থেকে তার আর কিছুই বিক্রি হয় না। ভয়ানক তাজ্জব লাগে মাগীটার, ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত তার খেয়াল হল, নিশ্চয় ওই লাল কোর্তাটাই অপয়া। জামাটা একবার সে পরে দেখেছিল, মনে হয়েছিল কে যেন তাকে একেবারে চারদিক থেকে চেপে ধরছে, সে তো আর খামকা নয়। বেশিক্ষণ আর ভাবনাচিন্তা না-করে জামাটি সে আগুনে ফেলে দিল—অলক্ষুণে জামাটা কিন্তু কিছুতেই পোড়ে না। 'কাণ্ড দেখ, ও নিশ্চয় শয়তানের দেয়া!' মাগীটা বুদ্ধি করে জামাটা এক চাষির গাড়ির মধ্যে গুঁজে দেয়। চাষিটা এসেছিল মাখন বিক্রি করতে। দেখে ভারি খুশি হয়ে গেল বোকাটা, তবে তার মাখনের দরটা পর্যন্ত কেউ জিজ্ঞেস করেও দেখতে চায় না। 'কে জানে কোন অলক্ষুণে এই জামাটা দিয়েছে গো!' কুড়ুল নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটল জামাটাকে। দেখে কী, টুকরোয় টুকরোয় জুড়ে গিয়ে যেমন কোর্তা ফের তেমনি। এবার সে ক্রুশ করে ফের কুড়ুলটা টেনে নিল, টুকরোগুলো সারা এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই থেকে প্রতি বছর আর ঠিক মেলাটির সময়েই শয়তান এসে সারা জায়গাটা ঢুঁড়ে বেড়ায়, শুয়োরের রূপ ধরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খুঁজে বেড়ায় তার কোর্তার টুকরোগুলো। লোকে বলে, সবই নাকি পেয়ে গেছে, বাকি আছে কেবল বাঁ হাতের আস্তিনটা। সেই থেকে লোকে জায়গাটা থেকে ক্রুশ করে পালায়, আর এই দশ বছর হল এই জায়গাতে মেলা বসেনি। সত্যি, ছোটো হাকিম যে কোন শনির টানে এই...'

বাকি কথাটা কাহিনীকারের ঠোঁটেই জমে গেল।

সশব্দে খুলে গেল জানলা, ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়ল কাচ, আর একটা ভয়ঙ্কর দর্শন শুয়োরের মুখ দেখা দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে যেন-বা জিজ্ঞেস করল, 'হেথায় কী করছে গো সব ভালো মানুষেরা?'

আট

...লেজ গুটিয়ে ঠিক কুকুরের পারা,
খুনির মতো ঠকঠকিয়ে কম্পিত;
নাকেতে ঝরে নস্য সিক্ত ধারা।

কথলিয়ারেভেস্কি 'এনেইদা'

ঘরের সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেল আতঙ্কে। মুখ হাঁ-করা অবস্থাতেই যেন পাথর হয়ে গেল স্যাঙাত; চোখদুটো তার বেরিয়ে এল, মনে হল বুঝি-বা গোলার মতো ছুটে যাবে; প্রসারিত আঙুলগুলো শূন্যেই নিশ্চল হয়ে রইল। লম্বাপানা বীরপুরুষটি দুর্নিবার বিভীষিকায় ঝট করে লাফিয়ে উঠতেই মাথায় ধাক্কা খেল কড়িকাঠে। ফলে তক্তাগুলো সরে গেল এবং পাদ্রিপুত্র সশব্দে ধপাস করে পড়ল মাটিতে। আঁ-আঁ-আঁ করে মরিয়ার মতো আর্তনাদ করে উঠল একজন, আতঙ্কে তক্তপোষের উপর থেবড়ে বসে পড়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল সে। 'কে আছ বাঁচাও গো!' বলে আরেকজন গা-ঢাকা দিল মেষচর্মের নিচে।

এই দ্বিতীয় বিভীষিকার ধাক্কায় স্যাঙাতের আড়ষ্টতা ঘুচে গেল, বৌয়ের ঘাগরার তলে লুকিয়ে সে কাঁপতে লাগল। লম্বাপানা বীরপুরুষটি গিয়ে ঢুকল একেবারে চুল্লির ভেতরে, এবং খোঁদলটা নিতান্ত অপরিসর হলেও কোনো রকমে সেঁধিয়ে ঢাকনা এঁটে দিল। আর

www.pathagar.com

চেরেভিক ঠিক যেন ফুটন্ত জলের ছ্যাঁকা খেয়ে টুপির বদলে একটা হাঁড়ি মাথায় দিয়ে ছুটে গেল দুয়োরের দিকে, উন্মত্তের মতো দৌড়তে লাগল দিশেহারা হয়ে; ধাবনের বেগ কিছুটা কমল কেবল ক্লান্তির চাপে। বুক তার ধড়াস ধড়াস করছিল ঠিক ঢেঁকির পাড়ের মতো, ঘাম ঝরছিল অঝোরে। অবসন্ন হয়ে এমনিতেই সে মাটিতে পড়ে যেত, হঠাৎ কানে এল কে যেন ছুটে আসছে তার পেছন পেছন ... নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার ...

'শয়তান! শয়তান!' প্রাণপণ শক্তিতে জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে এবং পরমুহূর্তেই অসাড় হয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে। তার পেছনেও শব্দ উঠছিল 'শয়তান! শয়তান!' এইটুকু সে শুনল, কী যেন সশব্দে পড়ে গেল তার উপর।

তারপরই জ্ঞান হারাল সে, সংকীর্ণ কফিনের এক ভয়াবহ বাসিন্দার মতো নির্বাক নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল রাস্তার মাঝখানে।

নয়

সামনে থেকে এমন কিছু নয়; কিন্তু পেছন থেকে,
বাপরে, একেবারে শয়তানের মতো!
লৌকিক কাহিনী

'শুনছিস, আস!' রাস্তার উপর ঘুমন্ত এক লোকের মধ্য থেকে একজন উঠে বসে বলল, 'কাছাকাছি কে একজন শয়তানের নাম নিচ্ছিল!'

পাশেই যে বেদেটা শুয়েছিল সে পা টান করে বিড়বিড় করল, 'বয়েই গেল আমার। শয়তানদের গোটা জাতটারই নাম নিক-না কেন।'

'কিন্তু এমনভাবে চেঁচাল যেন টুঁটি চেপে ধরেছে কেউ!'

'ও ঘুমের মধ্যে লোকে তো কত কী-ই চ্যাঁচায়!'

'সে যাই বল, অন্তত একবার দেখা দরকার। নে চকমকি ঠোক!'

দ্বিতীয় বেদেটা আপন মনে কী গজর গজর করে উঠে দাঁড়াল, বার দুয়েক বিদ্যুতের মতো ফুলকির ঝলকে আলো হয়ে উঠল তার মুখ, ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাল, এবং হাতে 'কাগানেৎস' অর্থাৎ একটা ভাঙা খোলায় ভেড়ার চর্বি দিয়ে জ্বালানো প্রচলিত মালোরুশীয় বাতি নিয়ে পথ আলো করে যাত্রা করল।

'দাঁড়া তো, এখানে কী যেন পড়ে আছে; আলো দেখা তো!'

এই সময় আরো কিছু লোক জুটল তাদের সঙ্গে।

'কী পড়ে আছে রে আস?'

'দুটো লোকের মতো মনে হচ্ছে; একটা উপরে, আরেকটা তলে, এদের কোনটা যে শয়তান ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।'

'উপরেরটা কে?'

'একটা মাগী!'

'তবে তো ঠিকই, শয়তানই বটে!'

সকলের হো হো হাসিতে প্রায় গোটা রাস্তাটাই জেগে উঠল।

'আরে মাগী উঠেছে মদ্দার উপর; এ মাগীটা তাহলে চেপে যেতে জানে বলো!' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল।

'আরে দেখো হে, দেখো, দেখো!' চেরেভিকের মাথায় তখনো হাঁড়ির যে আধখানা লেগেছিল সেই খোলাটা তুলে বলল আরেক জন, 'কী টুপি পরেছিলেন বীরপুরুষটি!'

www.pathagar.com

ক্রমবর্ধমান কোলাহল ও হাসাহাসিতে আমাদের মড়াদু'টির সাড়া জাগল। সলোপি আর তার বৌ তখনো বিগত আতঙ্কটায় পরিপূর্ণ, ফ্যাল ফ্যাল করে তারা সভয়ে তাকিয়ে রইল বেদেগুলোর কালচে মুখের দিকে : দপদপে ওই আলোর মিটমিটে ছটায় তাদের মনে হচ্ছিল যেন এক অনন্ত রাত্রির অন্ধকারে পাতালপুরীর গাঢ় বাষ্পে আচ্ছন্ন একদল উদ্দাম প্রেত।

দশ

আলাই বালাই, দূর হ প্রেতচ্ছায়া!
মালোরুশীয় কমেডি থেকে

নিদ্রোত্থিত সরোচিনেৎস গ্রামের ওপর সকালের তাজা আমেজ বয়ে গেল। সমস্ত চিমনি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠল উদীয়মান সূর্যের অভিমুখে। কলকলিয়ে উঠল মেলা। শুরু হল ভেড়ার ব্যা-ব্যা, ঘোঁড়ার চিঁহি চিঁহি; ফের হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক আর পশারিনীদের চেঁচামেচি উঠতে লাগল সমস্ত এলাকা জুড়ে আর লাল কোর্তার ভয়াবহ যে সব গুজব আঁধারের রহস্যঘন সময়টায় লোকজনের মধ্যে অমন আতঙ্ক জাগিয়েছিল তা অন্তর্ধান করল প্রত্যুষের সঙ্গে সঙ্গেই।

হাই তুলে গা টান করে চেরেভিক তন্দ্রা উপভোগ করছিল তার স্যাঙাতের খড়ে ছাওয়া চালার নিচে, বলদ আর গম-ময়দার বস্তার মাঝখানে, মনে হচ্ছিল যেন তার স্বপ্নের আমেজটুকু ছেড়ে ওঠার কোনো ইচ্ছেই নেই, এমন সময় হঠাৎ যে কণ্ঠস্বরটি তার কানে এল সেটি তার আলস্যের আশ্রয়, লক্ষ্মীমন্ত চুল্লিটির মতোই, কিংবা তার ঘরের দুয়োর থেকে দশ পা দূরের দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার চালানো শুঁড়িখানাটার মতোই অতিপরিচিত।

'ওঠ! উঠে পড়!' প্রাণপণে হাত ধরে টানতে টানতে তার মমতাময়ী গৃহিণী তার কানের কাছে ঝঙ্কার তুলল।

উত্তর দেবার বদলে চেরেভিক গাল ফুলিয়ে দুই হাত ঢাক পিটানোর ভঙ্গিতে নাড়তে লাগল।

'আ-মরণ, মাথা খারাপ হল নাকি!' আস্ফালিত যে হাতের ঘুষি আরেকটু হলেই তার মুখে এসে পড়ত তা থেকে পিছিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল গিন্নি।

চেরেভিক উঠে বসে খানিকটা চোখ কচলে চারদিকে চেয়ে দেখল, 'মাইরি বলছি গো, তোর মুখখানা আমার মনে হয়েছিল যে একটা ঢাক, মস্কালদের মতো করে সেটা আমায় দমাদম পিটতে হুকুম দিয়েছে ওই সেই শুয়োরমুখোগুলো, আমাদের স্যাঙাত যাদের কথা বলছিল...'

'হয়েছে, খুব হয়েছে। তোর যত বাজে কথার ভড়ং! উঠে যা এখনি ঘুড়ীটাকে বেচতে। লোকে হাসবে যে : মেলায় এল এক মুঠো তিসিও বেচলে না।'

'সত্যি কী হবে বল বৌ,' যোগ দিল সলোপি, 'আমাদের নিয়ে যে এবার লোকে হাসাহাসিই করবে।'

'যা বাপু যা! লোকে এমনিতেই হাসবে তোকে দেখে!'

'দেখছিস তো এখনো হাতমুখও ধোয়া হয়নি', হাই তুলে পিঠ চুলকিয়ে বলল চেরেভিক এবং সেই ফাঁকে আলসেমি করার মতো খানিকটা সময় জুটাবার চেষ্টা করল।

'দেখো একবার, ফিটফাট হবার খেয়াল হল বাবুর কেমন সময়টিতে! ফিটফাট তুই কবে থেকেছিস? এই নে তোয়ালে, মুখ মুছে চলে যা...'

ওইখানেই জড়াপলটি কী একটা পড়েছিল, সেটাকে তুলে নিয়েই—আতঙ্কে ছুড়ে ফেলে দিল সে : এটা সেই লাল কোর্তার আস্তিন!

www.pathagar.com

খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে সে দেখল তার স্বামীটি একেবারে আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁত তার ঠকঠক করছে। ঐ দেখে আবার বলল ও, 'যা বাপু, নিজের কাজে!'

ঘোড়াটা খুলে ময়দানের দিকে যেতে যেতে আপন মনে গজর গজর করল চেরেভিক, 'ভালোই বৌনি হবে এবার! এই হতচ্ছাড়া মেলাটায় আসার তোড়জোড় যখন করেছিলাম তখনই কেমন বুক ভার ভার লাগছিল, যেন পিঠে একটা মরা গরু চাপিয়ে দিয়েছে কে। সে তো আর খামকা নয়; বলদজোড়াও দু'দুবার ঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তাতে আবার এই এতক্ষণে মনে হল, যাত্রা করেছি যে আবার সোমবারেই। বাস্, সবেতেই শনির দৃষ্টি!... পোড়ামুখো শয়তানটারও বড় খুঁতখুঁতি। একটা আস্তিন নয় না-ই রইল, পরলেই পারত বিনা আস্তিনে। তা নয়, যত ভালো লোকদের জ্বালাতন করে মারা। ধরো নয়, ঈশ্বর রক্ষা করুন, আমি যদি শয়তান হতাম তাহলে ওই কতগুলো হতচ্ছাড়া ন্যাতার জন্যে রাত করে ঢুঁড়ে বেড়াতাম কখনো?'

এইখানে একটা কড়া হেঁড়ে গলায় আমাদের চেরেভিকের দার্শনিকতায় ছেদ পড়ল। সামনে তার দাঁড়িয়ে ছিল একটা লম্বা বেদে।

'কী বেচছ গো ভালোমানুষের পো?'

বিক্রেতা কিন্তু চুপ করে রইল, তারপর বেদেটাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে, না থেমে, লাগামটাতেও ঢিলে না দিয়ে শান্তভাবে বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ কী বেচব!'

তার হাতের লাগামের দিকে চেয়ে বেদেটা বলল, 'বেল্ট নাকি?'

'তা বেল্টই বটে, যদি ঘোড়া দেখে তোর মনে হয় বেল্ট।'

'তবে ভায়া, বলি তোকে, শালার ঘোড়াটাকে তুই খড় খাইয়ে রেখেছিস বুঝি?'

'খড়?'

এই বলে চেরেভিক ভাবল লাগামে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘোড়াটাকে সে সামনে টেনে এই নির্লজ্জ নিন্দুকের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে, কিন্তু হাতটা তার অস্বাভাবিক লঘুতায় এসে ঠেকল তার থুতনিতে। তাকিয়ে দেখে—লাগামটা কাটা, আর কাটা লাগামের সঙ্গে বাঁধা আছে—সর্বনাশ! লোম তার খাড়া হয়ে উঠল!—বাঁধা আছে লাল কোর্তার আস্তিনের একটা টুকরো! থুতু ফেলে, ক্রুশ করে দু'হাত কাঁপিয়ে সে পালাল এই অপ্রত্যাশিত উপহারটির কাছ থেকে, ছোকরা জোয়ানের চেয়েও সে দ্রুত বেগে ছুটে গিয়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

এগার

আমারই ধন চুরি আমারই হাতে দড়ি

প্রবাদ

'ধর! ধর! ধর ওটাকে!' রাস্তার ভিড়াক্রান্ত প্রান্তটায় চেঁচিয়ে উঠল জনকয়েক ছোকরা এবং চেরেভিক টের পেল, হঠাৎ কয়েকটা সবল হাত তাকে জাপটে ধরেছে।

'বাঁধ ওটাকে! এই লোকটাই ভালোমানুষের ঘোড়া চুরি করেছে।'

'ঈশ্বরের দোহাই, বাপু, আমায় তোমরা বাঁধছ কেন গো?'

'আবার জিজ্ঞেস করছে দেখো! আর তুই কেন বাপু মেলায় আসা চাষি চেরেভিকের ঘোড়াটা চুরি করতে গেলি?'

'তোরা পাগল হলি নাকি ছোঁড়ারা! নিজেই নিজের জিনিস আবার কে কবে চুরি করে?'

www.pathagar.com

'ছেঁদো কথায় চিড়ে ভিজবে না হে! অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরেছিলি কেন তবে, একেবারে যেন খোদ শয়তান তোর পেছু নিয়েছে।'

'না ছুটে উপায় কী, যখন শয়তানের জামাটা...'

'খুব হয়েছে যাদুমণি! ও বলে আর যাকে পারো আমাদের ধোঁকা দিতে এসো না। ভুতুড়ে গুজব ছড়িয়ে লোককে ভয় দেখাবার জন্যে ছোটো হাকিমের কাছে তোর আরো এক চোট আছে!'

'ধর! ধর! ধর! ধর ব্যাটাকে!' হাঁক শোনা গেল রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে, 'ওই ব্যাটা, ওই পালাচ্ছে!'

চেরেভিকের চোখে পড়ল তার স্যাঙাত, অতি শোচনীয় তার অবস্থা, পিছমোড়া করে দু'হাত বাঁধা, তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা ছোকরা।

'তাজ্জব কাণ্ড সব!' বলছিল ছোকরাদের একজন, 'মুখ দেখলেই বোঝা যায় লোকটা চোর, কিন্তু কী বলছিল শুনছিলে? সবাই যখন জিজ্ঞেস করল অমন পাগলার মতো ছুটছিল কেন, বলে নস্যি নেবার জন্যে নাকি পকেটে হাত দিয়েছিল, আর নস্যির কৌটার বদলে নাকি টেনে বার করে এক টুকরো শয়তানের জামা, তা থেকে নাকি আগুন জ্বলে ওঠে, লোকটাও তাই দেখে ভোঁ ভোঁ দৌড়।'

'বটে, বটে! এ ওই একই ডেরার ঘুঘু। দুটোকে বাঁধো একসঙ্গে!'

বার

'কী করেছি বলো সুজন, কিবা অপরাধ,
কটুবাক্য কেন মোরে?' বললে বেচারি,
'কিসের তবে অমন করে ঠাট্টা-টিটকারি?
কিসের তরে কিসের তরে,' বলতে বলতে সে,
তিক্ত নয়ন জলধারে ভাসিয়ে দিলে যে।

আর্তেমভস্কি—গুলাক, 'জমিদারবাবু ও কুকুর'

একটা খোড়া চালার নিচে স্যাঙাতের সঙ্গে একত্রেই হাত-পা বাঁধা হয়ে শুয়েছিল চেরেভিক। জিজ্ঞেস করল, 'বাস্তবিকই তুই হয়তো একটা কিছু মেরেছিস স্যাঙাত, নয়?'

'তুইও তাই বলছিস স্যাঙাত! কোথাও যদি কোনো দিন আমি কিছু চুরি করে থাকি তো আমার হাত-পা খসে পড়বে, অবিশ্যি মায়ের কাছ থেকে ছানার পিঠে আর টক ক্রিম চুরি ছাড়া, তা-ও বছর দশেক বয়সে।'

'আমাদের এমন বিপদ কেন বল তো, স্যাঙাত? তোর অবিশ্যি তেমন কিছু নয়, তোকে বড়জোর বলবে যে তুই অন্যের জিনিস মেরেছিস। আর আমার এই পোড়া কপালে কী দুর্নাম দেখ দেখি : আমি নিজেই নাকি আমার নিজের ঘোড়া চুরি করেছি। বোঝাই যাচ্ছে স্যাঙাত জন্ম থেকেই কপালে আমাদের সুখ লেখা নেই।'

'অনাথ অভাগা আমরা হায় গো, কী হল আমাদের!'

এই বলে স্যাঙাত ফোঁপাতে লাগল :

'কী ব্যাপার, সলোপি?' এই সময় এসে জিজ্ঞেস করল গ্রিৎস্কো, 'তোমায় বাঁধলে কে?'

'গলোপুপেঙ্কো নাকি, ওই গলোপুপেঙ্কো!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সলোপি, 'আরে এই ছেলেটির সম্পর্কেই তোমায় বলছিলাম স্যাঙাত, বাহাদুর বটে! যদি মিছে বলি তো আমার

www.pathagar.com

মাথায় বজ্রপাত হবে,—তোর মাথার চেয়ে কম নয় এমন এক ভাঁড় মদ ও আমার সামনে চোঁচোঁ মেরে দিল, মুখ একটু কোঁচকালেও না।'

'আর তুই কী, স্যাঙাত, অমন বাহাদুর ছোকরা, আর তাকে তুই মান্যি করলি না?'

'কী আর বলি, দেখতেই পাচ্ছিস,' গ্রিৎস্কোর দিকে ফিরে বলল চেরেভিক, 'ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন তোর কাছে অপরাধ করেছি বলে। ভালো মানুষ তুই, মাপ করে দে ভাইটি। মাইরি বলছি, তোর জন্যে সবকিছু করতে রাজি ...তবে কী বলবি বল! গিন্নির মাথায় যে ভূত চেপে আছে!'

'তা আমি অমন রাগ পুষে রাখা লোক নই। যদি চাও তো আমি তোমায় খালাস করে দিতে পারি।'

এই বলে সে ছোকরাগুলোর দিকে চোখ-ইশারা করল এবং যারা পাহারা দিচ্ছিল তারাই ছুটে এল বাঁধন খুলতে। 'তার বদলে তুমি তোমার উচিত কর্তব্য করো; বিয়েটা লাগাও গো! এমন মাতন মাতা চাই, যেন গোপাক নাচের পা-ব্যথা সারা বছরেও না যায়।'

'বাহবা, কী বাহবা!' হাততালি দিয়ে বলে উঠল সলোপি, 'মনটা আমার এমন ফুর্তি লাগছে যে মনে হচ্ছে যেন আমার গিন্নিটিকে লুটে নিয়ে গেছে মস্কালরা। সত্যি, ভেবে আর কী হবে; যে যা বলে বলুক, আজই লাগাও বিয়ে। হেস্তনেস্ত হয়ে যাক!'

'মনে রেখো কিন্তু সলোপি, ঘণ্টাখানেক বাদে আমি তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হব। সেখানে তোমার মাদি ঘোড়াটি আর গম কেনার জন্যে লোক জুটেছে দেখো গে।'

'সে কী! পাওয়া গেছে ঘোড়াটা?'

'হাঁ, পাওয়া গেছে!'

আনন্দে চেরেভিকের আর নড়ন-চড়ন নেই, গ্রিৎস্কোর গমনপথের দিকে সে চেয়ে রইল অপলকে।

'কী গ্রিৎস্কো, কাজটা খারাপ উৎরোয়নি, বলো?' হন্তদন্ত ছেলেটিকে বলল সেই লম্বা বেদেটা, 'বলদজোড়া এবার আমার তো?'

'তোর! তোর!'

তের

ভয় কিসের লো, ভয়ে ভীত,
পায়ে দে সোনার জুতো,
দলে যা শত্রুদলে
পায়ের তলে;
যেন তোর জুতোর নালে
ঝমঝমায়!
যেন তোর শত্তুরে সব
চুপ করে যায়!

বিয়ের গান

হাতের উপর তার সুন্দর থুতনিটি রেখে একা একা ঘরে বসে ভাবছিল পারাস্কা। তার হালকা বাদামি মাথাটির চারপাশে নানা স্বপ্নের মেলা। থেকে থেকে হঠাৎ একটা হালকা হাসি ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার রক্তিম ঠোঁট, কী-একটা আনন্দের অনুভূতিতে উঁচু হয়ে উঠছিল তার কালো ভুরু। তারপর ফের একটা ভাবনার মেঘ নেমে আসছিল তার উজ্জ্বল বাদামি চোখের ওপর।

www.pathagar.com

'কিন্তু ও যা বলেছে তা যদি না-হয়?' কী একটা আশঙ্কার ভাব করে গুঞ্জন করল ও, 'যদি আমায় সম্প্রদান না-করে,যদি... না না, তা হবে না! আমার সৎমা'র যা খুশি হয় সবই করে। আর আমার যা খুশি, তা আমি করতে পারব না? একগুঁয়েমি আমারও বেশ আছে। কী সুন্দর! কী অপরূপ হয়ে জ্বলজ্বল করে তার কালো চোখ! কী আদর করে ও ডাকে, পারাসিয়া নয়নমণি আমার! কী সুন্দরই মানায় তার সাদা চাপকানটা। কোমর-বন্ধটা আর একটু ঝকঝকে হলে কী ভালোই হত!... নতুন ঘরে বাসা পাতলেই একটা নতুন বুনে দেব, সত্যি!' ভাবতেই এমন আনন্দ হয় যে, মেলায় সে যে লাল কাগজ আঁটা ছোট্ট একটি আয়না কিনেছিল সেটি সে বুকের মধ্যে থেকে বের করে গোপন তৃপ্তিতে দেখতে দেখতে বলল, 'ভবিষ্যতে কখনো যদি আমার সৎমায়ের সঙ্গে কোথাও দেখা হয়, প্রাণ গেলেও কখনো তাকে নমস্কার করব না, বুক ফেটে মরুক গে। না গো সৎমা, সৎমেয়েটিকে তুমি অনেক জ্বালিয়েছ! বরং বালির মুঠা পাথর হবে, ওকগাছ হোগলার মতো নুয়ে পড়বে। কিন্তু তোমার সামনে মাথা আমার নুইবে না! ও হ্যাঁ, ভালো কথা মনে হল... দেখি একবার সধবা মেয়ের টুপি পরে মানায় কেমন, নয় সৎমা'র টুপিটাই পরি!'

আয়নাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগল, এই বুঝি পড়ে যাবে, চোখে তার ভেসে উঠল মেঝের বদলে হাঁড়িকলসির তাক আর কড়িকাঠের উপর পাতা তক্তাটার ছবি, যেখান থেকে উল্টে পড়েছিল পাদ্রিপুত্র।

'দেখো দিকি, ঠিক যেন বাচ্চার মতো,' হেসে বলল সে, 'পা ফেলছি ভয়ে ভয়ে!'

এই বলে ঠুক ঠুক করে পা ফেলতে লাগল সে, ক্রমেই জোর বাড়ল তার : শেষ পর্যন্ত বাঁ হাতটা কোমরে রেখে নাচতে শুরু করে দিল, ডান হাতে আয়নাটা, জুতোর হিলে ঠকাঠক শব্দ তুলে গাইতে লাগল তার প্রিয় গানটি :

সবুজ গো তুই বনলতা
যা বিছিয়ে নিচেতে!
তুই গো আমার কাজল ভুরু
আয় গো সরে কাছেতে!

সবুজ ও গো বনের লতা
আরো নিচুতে যা বিছিয়ে!
প্রিয়তম গো, কাজল ভুরু
আয় সরে গো, আরো কাছিয়ে!

এই সময় দরজায় উঁকি দিল চেরেভিক, আয়নার সামনে মেয়েকে নাচতে দেখে থেমে গেল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে, হাসল মেয়ের অদ্ভুত খেয়ালে, মেয়ে অবশ্য নিজের মধ্যেই যেন তন্ময় হয়ে কিছুই লক্ষ করছিল না। কিন্তু গানের সুপরিচিত ঝঙ্কার কানে আসতেই চেরেভিকের বুকের মধ্যে দুলে উঠল, কোমরে হাত দিয়ে সগর্বে মাথা উঁচিয়ে এগিয়ে গেল সে, নাচতে শুরু করে দিল নিজের সব কাজ ভুলে। স্যাঙাতের উচ্চ হাসিতে দু'জনেই চমকে উঠল।

'সাবাস, বাপে-মেয়েতে দিব্যি বিয়ের ধুম লাগিয়ে দিয়েছে দেখছি! শিগ্‌গির করে চল, বর এসেছে!'

এই শেষ কথাটায় পারাস্কা তার মাথায় বাঁধা লাল ফিতেটার চেয়েও রাঙা হয়ে উঠল আর তার নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত পিতামশাইয়ের স্মরণ হল কী কারণে বর আসা সম্ভব।

www.pathagar.com

ভয়ে ভয়ে চারদিক তাকিয়ে-টাকিয়ে সে বলল, 'তবে আর কী, চল বেটি তাড়াতাড়ি, ঘোড়া বিক্রি হয়েছে এই খুশিতে হিভ্রিয়া ছুটে গেছে যত কাপড়-চোপড় কিনতে, তাই ও ফেরার আগেই সব সেরে ফেলতে হবে!'

বাড়ির চৌকাঠ পেরোতে না-পেরোতেই পারাস্কা টের পেল সে সেই সাদা চাপকান পরা ছেলেটির বাহুবদ্ধা হয়েছে, একদল লোকের সঙ্গে রাস্তায় অপেক্ষা করছিল সে।

'ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন!' ওদের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে বলল চেরেভিক, 'ফুলের মালার মতো গাঁথা হয়ে থাকো দুটিতে!'

এই সময় লোকজনের মধ্যে একটা গোলমাল শোনা গেল।

'বরং বুক ফেটে মরব, তবু এটি হতে দেব না!' শোনা গেল সলোপির সহধর্মিণীর গলা, উচ্চহাস্যে ভিড়ের লোকেরা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল তাকে।

'চটিস না বৌ, চটিস না!' ষণ্ডাগণ্ডা দুই বেদে তার হাত চেপে ধরে আছে দেখে নির্ভীক কণ্ঠে বলল চেরেভিক, 'যা হবার হয়ে গেছে, কথার খেলাপ আমি ভালোবাসি নাগো!'

'কিছুতেই না, এ হতে পারে না, এ চলবে না!' হিভ্রিয়া চেঁচালে বটে, তবে কেউ তার কথা শুনছিল না। নবদম্পতির চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল আরো কয়েক জোড়া ছেলেমেয়ে, গড়ে তুলল দুর্ভেদ্য এক নৃত্যের প্রাচীর।

মোটা খাদির কোর্তা পরা লম্বা লম্বা পাকানো মোচওয়ালা বাজনদারের ছড়ের একটি আঘাতেই সবাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কীভাবে এক হয়ে উঠতে পারে, সঙ্গতিতে মিলে যেতে পারে, সেটা দেখলে অদ্ভুত অবর্ণনীয় এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন না-হয়ে কেউ পারে না। যে সব লোকের গোমড়া মুখ দেখে মনে হয় সারা জীবনেও সেখানে হাসি ফোটেনি, তারা সবাই পা ফেলতে লাগল দুমদাম, কাঁধ নাচাতে লাগল। সবাই ঘুরছে, সবাই নাচছে। কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত, অবোধ্য এক অনুভূতি জেগে ওঠে বুকের গহীনে যখন দেখা যায় জরাজীর্ণ মুখের ওপর সমাধির উদাসীনতা এমনসব বৃদ্ধারাও এসে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে নতুন, হাস্যময়, জীবন্ত মানুষগুলোর মধ্যে। উদ্বেগ নেই, তারুণ্যের আনন্দটুকুও নেই, নেই সহানুভবের ঝলক, শুধু নেশার তাড়নাতেই তারা যান্ত্রিকের নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো কিছু মানবসুলভ অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে, মাতাল মাথাগুলো দোলাচ্ছে ধীরে ধীরে, নেচে চলেছে আনন্দমত্ত লোকগুলোর পিছু পিছু, নবদম্পতির দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করছে না।

শোরগোল, হাসাহাসি, গান স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। সুর মরে গেল, অস্পষ্ট ঝঙ্কার তার ম্লান হয়ে হারিয়ে গেল শূন্যে। কোথাও যেন তখনো শোনা যাচ্ছিল নৃত্য পদপাতের ধ্বনি, দূর এক সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনির মতো, তারপর অচিরেই সবকিছু হয়ে উঠল নির্জন নিস্তব্ধ।

ঠিক এমনি করেই কি মিলিয়ে যায় না আমাদের আনন্দ, আমাদের সুন্দর, চঞ্চল অতিথিটি, একক একটি ঝঙ্কার বৃথাই হর্ষ ফোটাতে চায়? নিজের প্রতিধ্বনিতেই তা শোনে এক বিষাদ ও শূন্যতার মীড়, নিজেই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। উদ্দাম উত্তাল তারুণ্যের নানা সঙ্গীরা কি এইভাবেই দুনিয়ায় একের পর এক নির্জনে হারিয়ে যায় না, একাকী পড়ে থাকে শুধু তাদের এক বৃদ্ধ ভাই! বিস্বাদ তার জীবন, যে পড়ে রইল! বুক তার হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ, উপায় তার কিছু নেই।

* নভেম্বর ৬ *

www.pathagar.com

নাক

এক

মার্চ মাসের ২৫ তারিখে সেন্ট পিটার্সবুর্গে একটা অসাধারণ রকমের ঘটনা ঘটল। ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিন্যুয়ের অধিবাসী নাপিত ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ (পদবিটা তার হারিয়ে গেছে, এমনকি নেই তার দোকানের সাইনবোর্ডেও, সেখানে আঁকা আছে একগাল সাবানের ফেনামাখা এক ভদ্রলোকের ছবি আর লেখা আছে 'রক্তমোক্ষণও করা হয়'), বেশ ভোরে ঘুম ভাঙতেই গরম রুটির গন্ধ পেল। খাটের উপর দেহটা সামান্য উঁচু করে তুলতেই সে দেখতে পেল যে কফির দারুণ ভক্ত, পরম শ্রদ্ধেয়া মহিলা, তার সহধর্মিণীটি চুল্লি থেকে সদ্য-সেঁকা রুটি টেনে বের করছে।

'প্রাসকোভিয়া ওসিপভ্‌না, আজ আর আমি কফি খাব না', ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ বলল, 'তার বদলে পিঁয়াজ দিয়ে খানিকটা গরম রুটি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

(আসলে ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ মনে মনে কফি এবং রুটি দুটোই চাইছিল, কিন্তু সে জানত যে একবারে দুটি বস্তু চাওয়া হবে সম্পূর্ণ নিরর্থক, যেহেতু প্রাসকোভিয়া ওসিপভ্‌না এ ধরনের আবদার মোটেই বরদাস্ত করে না।) 'আহাম্মকটা রুটি খাবে; আমারই ভালো, বাড়তি এক ভাগ কফি জুটবে', মনে মনে এই ভেবে তার স্ত্রী টেবিলের উপর একটা রুটি ছুড়ে দিল।

ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ভদ্রতার খাতিরে জামার উপরে কোট চাপাল, টেবিলের পাশে বসে খানিকটা নুন ঢালল, দুটো পিঁয়াজ ছাড়াল, ছুরি হাতে নিল এবং গম্ভীর মুখভঙ্গি করে রুটি কাটতে বসল। রুটিটা দু'ভাগ করে কাটার পর মাঝখানটায় তার চোখ পড়ল, অবাক হয়ে গেল সেখানে সাদা একটা কিছু দেখতে পেয়ে। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ সন্তর্পণে সেটাকে ছুরি দিয়ে খোঁচাল, আঙুল দিয়ে টিপে দেখল। 'আঁটসাঁট গোছের দেখছি!' মনে মনে বলল সে, 'কী হতে পারে এটা?'

সে আঙুল পুরে দিয়ে টেনে বার করল জিনিসটাকে—একি একটা নাক! ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ থ হয়ে গেল; চোখ রগড়াতে রগড়াতে, জিনিসটা বারে বারে হাতড়ে দেখতে লাগল : নাক। নাক যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! শুধু তা-ই নয়, মনে হচ্ছিল যেন কোনো লোকের নাক সেটা। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের চোখে-মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ভাব। কিন্তু যে ক্রোধ তার স্ত্রীরত্নটির ওপর এসে ভর করল সেটার তুলনায় এই আতঙ্ক নেহাৎই তুচ্ছ।

'ওরে কসাই, কোথা থেকে কার নাক কেটে এসেছিস তুই! শুনি?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল সে? 'ঠগ! মাতাল! আমি নিজে তোর নামে পুলিশে রিপোর্ট করব! কী ডাকাত বাবা রে বাবা! আগেই আমি তিন-তিনজন লোকের কাছে শুনেছি, দাড়ি কামানোর সময় তুই কোনো লোকের নাক নিয়ে এমন টানাটানি করিস যে নাক নিজের জায়গায় টিকে নেহায়েতই থাকে কোনোরকমে।'

www.pathagar.com

ইভান ইয়াকভ্লেভিচের তখন জীবন্মৃত অবস্থা। সে চিনতে পারল যে এই নাকটা সরকারি কালেক্টর কভালিওভের ছাড়া আর কারও নয়। লোকটা প্রতি বুধবার ও রবিবার তার কাছে কামাতে আসে।

'দাঁড়াও, প্রাসকোভিয়া ওসিপভ্না! আমি ওটাকে একটা নেকড়ায় জড়িয়ে কোণায় রেখে দিই; ওখানে না-হয় খানিকক্ষণ পড়ে থাক, পরে বাইরে নিয়ে যাব।'

'কোনো কথা শুনতে চাই না! ভেবেছিস কাটা-নাক ঘরে পড়ে থাকবে, এটা আমি বরদাস্ত করব?... চালাকি! জানিস তো কেবল চামড়ার বেল্টের ওপর ক্ষুর ঘষতে, শিগগিরই নিজের কাজটা করার মতোও অবস্থা তোর থাকবে না রে হতভাগা, পাজি, বদমাশ! তোর হয়ে পুলিশের কাছে আমি সাফাই গাইতে যাব ভেবেছিস?... ওরে বুদ্ধির ঢেঁকি, হতচ্ছাড়া নোংরা কোথাকার! নিয়ে যা ওটাকে এখানে থেকে! এক্ষুনি! যেখানে খুশি নিয়ে যা! ত্রিসীমানায় যেন ওটাকে দেখতে না-পাই!'

ইভান ইয়াকভ্লেভিচ দাঁড়িয়ে রইল মড়ার মতো কাঠ হয়ে। সে ভেবে ভেবে ব্যাপারটার কোনো কূলকিনারা খুঁজে পেল না।

'কে জানে বাবা কী করে এটা হল', সে হাত দিয়ে কানের পেছনটা চুলকে শেষকালে বলল, 'গতকাল মাতাল অবস্থায় ফিরছিলাম না কি তা-ও তো ঠিক বলতে পারছি না। এদিকে সমস্ত দেখেশুনে মনে হচ্ছে ঘটনাটা অবাস্তব, কেননা রুটি হল গিয়ে সেঁকা জিনিস, আর নাক একেবারেই জ্যান্ত বস্তু। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!...'

ইভান ইয়াকভ্লেভিচ চুপ করে গেল। পুলিশ তার কাছ থেকে নাক খুঁজে পেলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে—এই চিন্তায় তার সংজ্ঞা লোপ পাবার মতো অবস্থা হল। তার মনে হতে লাগল যে সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে রুপোর জরিতে সুন্দর কাজ করা লাল টকটকে কলার, তলোয়ার...সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। সে তার ট্রাউজার্স ও বুটজোড়া বের করল, ঐ সমস্ত জঞ্জাল নিজের গায়ে আঁটল, তারপর প্রাসকেভিয়া ওসিপভ্নার কঠোর নির্দেশের সঙ্গে তাল রেখে নাকটাকে নেকড়ায় জড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

তার ইচ্ছে ছিল কোথাও ওটাকে পাচার করে দেয় : হয় তোরণের নিচে বেদির আড়ালে, নয়ত হঠাৎ হাত থেকে ফেলে দিয়ে পাশের কোনো গলিতে সটকে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো না কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতে লাগল। তারা তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিল জিজ্ঞাসাবাদ : 'কোথায় যাচ্ছ?' কিংবা 'এত সকালে কাকে খেউরি করতে চললে?'—ফলে ইভান ইয়াকভ্লেভিচ কিছুতেই ওটা ফেলার মতো সময় করে উঠতে পারল না। একবার সে ওটাকে হাত থেকে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল, কিন্তু গুমটিতে প্রহরারত কনস্টেব্ল্ দূর থেকে তার হাতিয়ার দিয়ে নির্দেশ করে বলল, 'এই যে, কী একটা জিনিস যেন তোমার হাত থেকে পড়ে গেছে!' ইভান ইয়াকভ্লেভিচের পক্ষে তখন নাকটা তুলে নিয়ে পকেটে লুকিয়ে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। হতাশ হয়ে পড়ল সে। দোকানপাট খুলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত বেড়ে চলল অবিরাম।

সে ঠিক করল ইসাকিয়েভস্কি ব্রিজের দিকে যাবে : সেখান থেকে কি আর কোনোমতে ওটাকে নেভা নদীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যাবে না? ... হ্যাঁ, অপরাধ খানিকটা আমারই যে বহু দিক থেকে শ্রদ্ধাভাজন ইভান ইয়াকভ্লেভিচ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো কথাই আমি বলিনি।

www.pathagar.com

যে কোনো নিষ্ঠাবান রুশি কর্মকুশলীর মতো ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ছিল পাঁড় মাতাল। সে প্রতিদিন অন্য লোকের চিবুকের ওপর ক্ষৌরিকর্ম করত, কিন্তু তার নিজের চিবুকে কস্মিনকালে ক্ষুর পড়ত না। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের টেইল-কোট (ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ কদাচ-কোট পরত না) ছিল চকরাবকরা; সেটার কালো রঙের উপর আগাগোড়া খয়েরি-হলুদ ও ছাইরঙা ছোপ ধরা; কলারটা চিকচিক করত, কিন্তু তিনটি বোতামের জায়গায় ঝুলত কেবলই সুতো। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ছিল ভয়ঙ্কর মানববিদ্বেষী—সরকারি কালেক্টর কভালিওভ যখন দাড়ি কামানোর সময় অভ্যাসবশে তাকে বলত : 'ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ, তোমার হাতে সবসময় একটা দুর্গন্ধ!'—জবাবে ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ, প্রশ্ন করত : 'দুর্গন্ধ কেন হতে যাবে?' 'জানি না ভায়া, তবে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।' সরকারি কালেক্টরের কথার প্রতিফলস্বরূপ ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ তখন এক টিপ নস্যি টেনে নিয়ে তার গালে, নাকের নিচে, কানের পেছনে, চিবুকের নিচে—এক কথায় নিজের খেয়ালখুশি মতো যেখানে-সেখানে সাবান ঘরে দিত।

এহেন শ্রদ্ধাভাজন নাগরিকটি দেখতে দেখতে ইসাকিয়েভ্‌স্কি ব্রিজে এসে পৌঁছুল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল প্রথমে; তারপর রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ল, যেন ব্রিজের নিচে অনেক মাছ ছুটোছুটি করছে কিনা দেখছে। তারপর নেকড়ায় জড়ানো নাকটা ফেলে দিল চুপি-চুপি। তার মনে হল যেন কয়েক মন ওজনের ভার হঠাৎ বুক থেকে নেমে গেল তার; ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ঈষৎ হাসলও। সরকারি কর্মচারিদের চিবুক খেউরি করতে না গিয়ে সে এক গ্লাস পাঞ্চের অর্ডার দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল 'খানা আর চা' সাইনবোর্ড লেখা একটা হোটেলের দিকে। এমন সময় হঠাৎ দেখল ব্রিজের অন্যপ্রান্তে গালপাট্টা জুলপিঅলা তেকোন টুপি মাথায়, তলোয়ারধারি সম্ভ্রান্ত চেহারার পুলিশ ইনস্পেক্টর আসছে। ভয়ে ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের প্রাণ উড়ে যাবার মতো হল। এমনি সময় পুলিশ ইনস্পেক্টর তার দিকে আঙুল নেড়ে ইশারা করে বলল, 'এদিকে এসো দেখি ভালোমানুষের পো!'

ইভানক ইয়াকভ্‌লেভিচের দস্তুর জানা ছিল, তাই অনেক দূর থেকেই মাথার টুপি খুলে চটপট তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'সালাম হুজুর!'

'না না ভায়া, ও সব হুজুর-টুজুর নয়, বল দেখি ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিলে ওখানে?'

'ঈশ্বরের দিব্যি কর্তা, খেউরি করতে যাচ্ছিলাম, তাকিয়ে দেখলাম নদী কী রকম তরতর করে বয়ে চলেছে।'

'মিছে কথা, মিছে কথা! ও সব বলে পার পাবে না। ঠিকমতো জবাব দাও বলছি!'

'আমি, কর্তা, কোনোরকম খরচ ছাড়াই সপ্তাহে দু'বার এমনকি তিনবারও আপনার খেউরি করতে রাজি', ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ জবাব দিল।

'না বন্ধু, ওতে চলবে না! তিনজন নাপিত আমার খেউরি করে, আর এ কাজটাকে তারা পরম সম্মানের বলেও মনে করে। এবারে বলে ফেল দেখি বাপু ওখানে কী করছিলে?'

ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।... কিন্তু এখানে ঘটনা সম্পূর্ণ কুয়াশার নিচে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় এর পরে কী ঘটেছিল তার বিন্দুবিসর্গও আমাদের জানা নেই।

দুই

খুব ভোরে সরকারি কালেক্টর কভালিওভের ঘুম ভেঙে গেল। সে ঠোঁট নেড়ে আওয়াজ করল, 'বর্‌র্‌...'। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে বরাবরই ঐ শব্দ করে থাকে, যদিও নিজেই

www.pathagar.com

বলতে পারে না কেন সে করে অমনটা। কভালিওভ আড়িমুড়ি ভেঙে টেবিলের উপর থেকে ছোটো আয়নাটা নেবার জন্যে এগিয়ে গেল। গতকাল সন্ধ্যায় তার নাকের উপর যে ফুসকুড়িটা উঠেছিল সেটা একবার দেখবে এই ইচ্ছে। কিন্তু সে বেজায় হকচকিয়ে গেল যখন দেখতে পেল যেখানে তার নাকটা থাকার কথা সে জায়গাটা পুরোপুরি চেটাল। ঘাবড়ে গিয়ে কভালিওভ জল এনে তোয়ালে দিয়ে চোখ রগড়াল, কিন্তু নাক নেই! সে ঘুমোচ্ছে কিনা বোঝার উদ্দেশ্যে চারপাশ হাতড়ে দেখতে লাগল। না, ঘুমোচ্ছে বলে তো মনে হয় না। সরকারি কালেক্টর কভালিওভ খাট থেকে লাফিয়ে নেমে গা ঝাড়া দিল : নাক নেই!... সে তৎক্ষণাৎ পরনের পোশাক তলব করল, সোজা ছুটল পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে।

কিন্তু এই অবসরে কভালিওভ সম্পর্কেও কিছু বলা আবশ্যক, যাতে পাঠক বুঝতে পারেন এই সরকারি কালেক্টরটি কোন গোত্রের লোক। যে সমস্ত সরকারি কালেক্টর তাঁদের বিদ্যার সার্টিফিকেট ও ডিগ্রির জোরে এই খেতাবের অধিকারী হন, ককেশাসে যাঁরা কালেক্টর পদ লাভ করেন, তাঁদের সঙ্গে এঁদের কোনোমতেই তুলনা চলে না। এঁরা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। বিদ্বান সরকারি কালেক্টররা...কিন্তু রাশিয়া এমনই আজব দেশ যে কোনো একজন সরকারি কালেক্টর সম্পর্কে কিছু বলে দেখুন না, অমনি রিগা থেকে কাম্‌চাত্‌কা পর্যন্ত সব সরকারি কালেক্টর সেটাকে নিজের গায়ে নিয়ে নেবেন। যে-কোনো খেতাব এবং পদ সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কভালিওভ ছিল ককেশীয় সরকারি কালেক্টর। সে মাত্র দু বছর হল এই খেতাব পেয়েছে, তাই মুহূর্তের জন্যও সেটাকে ভুলতে পারে না; আর নিজের কৌলিন্য ও গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে কখনও সরকারি কালেক্টর বলত না সে, সব সময় নিজের পরিচয় দিত মেজর বলে। রাস্তায় জামাকাপড়ের ফেরিওয়ালি কোনো মেয়েলোকের সঙ্গে দেখা হলে সচরাচর বলত, 'বুঝলে গো, আমার বাড়িতে চলে এস; সাদোভায়া স্ট্রিটে আমার ফ্ল্যাট; কেবল জিজ্ঞেস করলেই হবে মেজর কভালিওভ কোথায় থাকে; যে কেউ দেখিয়ে দেবে।' আর সুশ্রী চেহারার কোনো মেয়ের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যেত তাহলে তাকে গোপন নির্দেশ দিয়ে বলত, 'লক্ষ্মীটি আমার, জিজ্ঞেস করবে মেজর কভালিওভের ফ্ল্যাটটা কোথায়।' অতএব আমরাও এখন থেকে এই সরকারি কালেক্টটিকে মেজর বলেই উল্লেখ করব।

মেজর কভালিওভের অভ্যাস ছিল প্রতিদিন নেভ্‌স্কি এভিনিউতে পায়চারি করা। তার জামার কলার সব সময় বড় বেশি পরিচ্ছন্ন আর কড়া মাড় দেওয়া অবস্থায় থাকত। জুলফি-জোড়া তার এমন এক জাতের, যা এখনও দেখতে পাওয়া যায় জেলা আর সদরের আমিনদের মধ্যে, স্থপতি, রেজিমেন্টের ডাক্তার, এমনকি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে। মোট কথা, যে-সমস্ত পুরুষ মানুষের গাল ভরাট ও আরক্তিম এবং যারা বেশ ভালো বস্টন খেলে তাদের সকলেরই মধ্যে; এ ধরনের জুলফি গালের ঠিক মাঝখান দিয়ে এসে সোজা চলে যায় নাক অবধি। মেজর কভালিওভ দামি লাল পাথরের অসংখ্য সিল বুকে ঝোলাত, কতকগুলোর উপর থাকত নানা ধরনের প্রতীকচিহ্ন আর কতকগুলোর উপর থাকত বুধবার, বৃহস্পতিবার, সোমবার—এইসব খোদাই করে লেখা কথা। মেজর কভালিওভ সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসেছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, সঠিকভাবে বলতে গেলে, তার খেতাবের উপযোগী চাকরির সন্ধানে : এ ব্যাপারে সফল হলে তার পদ হবে ছোটোলাট পর্যায়ের, না হলে সে ঠিক করেছে কোনো একটা বিশিষ্ট ডিপার্টমেন্টে প্রশাসনিক পদ নেবে। বিয়ের ব্যাপারেও মেজর কভালিওভের আপত্তি নেই, কিন্তু একটি মাত্র শর্তে—পাত্রীর পুঁজির পরিমাণ হতে হবে অন্তত দু লাখ। সুতরাং মেজর যখন তার মোটামুটি চলনসই ও মাঝারি গোছের নাকের বদলে

www.pathagar.com

যাচ্ছেতাই রকমের লেপাপোঁছা, সমান জায়গা দেখতে পেল তখন তার সে কী মনের অবস্থা তা পাঠকের সহজেই অনুমেয়।

এর ওপর এমনই দুর্ভাগ্য যে রাস্তায় একটাও ঘোড়ার গাড়ির দেখা মিলল না। কাজেই উপরের ঢিলে আচকানটা গায়ে জড়িয়ে, যেন নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে এমন ভঙ্গিতে রুমালে মুখ ঢেকে পায়ে হেঁটে চলতে হল তাকে। 'হয়তো এটা আমার মনেরই ভুল : নাকটা বেমালুম উধাও হয়ে গেল এ হতেই পারে না'—ভাবতে ভাবতে সে ইচ্ছে করেই, আয়নায় একবার দেখার উদ্দেশ্যে এক মিঠাইয়ের দোকানে এসে উপস্থিত হল। সৌভাগ্যবশত দোকানে কেউ ছিল না। ছোকরা চাকরগুলো ঘরদোর সাফ করছিল, চেয়ার সাজিয়ে রাখছিল; কেউ কেউ ঘুম চোখে বারকোসে করে বার করে আনছিল গরম গরম পেস্ট্রি; চেয়ার-টেবিলের উপরে গড়াগড়ি যাচ্ছিল গতকালের কফি-ঢালা খবরের কাগজ। 'যাক, ঈশ্বরের কৃপায় কেউ নেই, এই ফাঁকে তাকিয়ে দেখা যেতে পারে।' বলে সে ভয়ে ভয়ে আয়নার দিকে এগিয়ে গেল, দেখল তাকিয়ে। 'ধুত্তোর, কী কাণ্ড দেখো তো!' তাকানোর পর সে বলল, 'নাকটার জায়গায় অন্তত অন্য কিছু-একটাও যদি থাকত, তা নয়, এক্কেবারে ফাঁক!...'

বিরক্ত হয়ে ঠোঁট কামড়ে সে মিঠাইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এল, ঠিক করল আজ আর অভ্যাসমতো কারও দিকে তাকাবে না, কারও উদ্দেশে অমায়িক হাসি হাসবে না। হঠাৎ একটা বাড়ির দরজার সামনে সে পাথরের মূর্তির মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; তার চোখের ওপর ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা : প্রবেশপথের সামনে এসে থামল একটা জুড়িগাড়ি; গাড়ির দরজা খুলে যেতে ঘাড় কুঁজো করে লাফ দিয়ে নামলেন ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক, ছুটে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন উপরে। কভালিওভ কী দারুণ আতঙ্কিত ও বিস্মিতই-না হয়ে গেল যখন এই লোকটিকে চিনতে পারল তার নিজের নাক বলে! এই অসাধারণ দৃশ্য দেখে তার মনে হল যেন চোখের সামনে সমস্ত কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে; মনে হচ্ছিল এই বুঝি সে পড়ে যাবে। কিন্তু ঠিক করল কপালে যা-ই থাক-না কেন, অপেক্ষা করে থাকবে যতক্ষণ-না নাক গাড়িতে ফিরে আসে। তার সর্বাঙ্গ তখন জ্বরো রুগীর মতো থরথর করে কাঁপছে। দু মিনিট বাদে নাক বাস্তবিকই বেরিয়ে এলেন। তাঁর ইউনিফর্মে সোনালি জরির কাজ, বিশাল খাড়া কলার আঁটা; পরনে হরিণের নরম চামড়ার প্যান্ট; এক পাশে ঝোলানো তলোয়ার। পালকগোঁজা টুপি দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পদমর্যাদার দিক থেকে তিনি একজন সরকারি পরামর্শদাতা। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছিল তিনি সাক্ষাৎকারের জন্য কোথাও চলেছেন। এ-পাশে ও-পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোচম্যানের উদ্দেশে তিনি হাঁক দিলেন, 'গাড়ি লাগাও!' বলেই তিনি চেপে বসলেন গাড়িতে, গাড়িও ছুটে চলল।

বেচারি কভালিওভের তখন মাথা খারাপ হওয়ার জো। সে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতেই পারছিল না। এই গতকালও যে-নাক তার মুখে সাঁটা ছিল, যার গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে কোনোভাবেই চলার ক্ষমতা ছিল না, সেটা কী করে সত্যি-সত্যিই ইউনিফর্ম ধারণ করতে পারে! সে ছুটল জুড়িগাড়ির পিছু পিছু। গাড়িটা সৌভাগ্যবশত তখনও বেশি দূরে যেতে পারেনি এবং যেতে যেতে থেমে দাঁড়িয়েছে কাজান ক্যাথেড্রালের সামনে।

সে ক্যাথেড্রালের ভেতরের উদ্দেশ্যে দ্রুত পা চালাল, ভিখিরি বুড়িদের সারির মাঝখান দিয়ে ঠেলেঠুলে পথ করে নিয়ে গির্জার ভেতরে প্রবেশ করল। নাক খসে পড়া এই ভিখিরি-বুড়িদের কাপড়ের জড়ানো মুখের উপর চোখের দুটো ফোকর দেখে এককালে তার বড়ই হাসি পেত। গির্জার ভেতরে প্রার্থনাকারীদের সংখ্যা বেশি ছিল না; তারা সকলে

www.pathagar.com

দরজায় ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কভালিওভের অবস্থা তখন এমনই বেসামাল যে প্রার্থনা করার কোনো সাধ্য তার নেই, সে আনাচে-কানাচে সর্বত্র দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল সেই ভদ্রলোকটিকে। অবশেষে সে তাঁকে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। নাকের মুখটা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে বিশাল খাড়া কলারের আড়ালে, তিনি পরম ভক্তিগদগদ ভঙ্গিতে প্রার্থনা করছেন।

'কী করে ওঁর সামনে যাওয়া যায়?' কভালিওভ ভাবল। 'ইউনিফর্ম, টুপি—সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে উনি একজন সরকারি পরামর্শদাতা। কী জানি ছাই, জানি না কী ভাবে কী করা উচিত!'

সে তাঁর কাছাকাছি এসে কাশতে শুরু করল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও নাকের ভক্তি-গদগদ অবস্থার কোনো বিকার ঘটল না, তিনি মাথা নুইয়ে প্রণাম করে চললেন।

'স্যার...' ভেতরে ভেতরে জোর করে সাহস সঞ্চয় করে বলল কভালিওভ, 'শুনছেন স্যার...'

'কী চাই আপনার?' ঘাড় ফিরিয়ে বললেন নাক।

'আমার তাজ্জব লাগছে স্যার...আমার মনে হয়... আপনার নিজের জায়গা নিজের জানা থাকা উচিত। অথচ দেখুন আপনার সাক্ষাৎ পেতে হল গিয়ে, গির্জায়। আপনাকে মানতেই হবে...'

'মাফ করবেন, আপনার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ... স্পষ্ট করে বলুন।'

'কী করে সব বুঝিয়ে বলা যায়?' কভালিওভ মনে মনে ভাবল, শেষকালে সাহস সঞ্চয় করে বলতে শুরু করল : 'অবশ্য আমি, হ্যাঁ, আমি... আসলে একজন মেজর। আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না যে নাক ছাড়া চলাফেরা করা আমার শোভা পায় না। ভস্‌ক্রেসেন্‌স্কি ব্রিজের উপর যারা ছাড়ানো কমলালেবু-টেবু বিক্রি করে ঐ রকম কোনো ফিরিওয়ালি মেয়ের পক্ষে নাকছাড়া বসে থাকা চলে; কিন্তু যেহেতু আমার জীবন ওদের মতো ভবিষ্যৎহীন নয়... তাছাড়া বহু বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে—সরকারি পরামর্শদাতা খেতেরিওভের স্ত্রী ইত্যাদি আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে... আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন... আমি আর কী বলব স্যার, জানি না...' (বলার সঙ্গে সঙ্গে মেজর কভালিওভ অসহায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল)। 'মাফ করবেন... ব্যাপারটাকে যদি ঠিক কর্তব্য ও সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়... তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারেন...'

'কিছুই বুঝতে পারছি না', নাক জবাব দিলেন। 'একটু বোঝার মতো করে বলুন।'

'স্যার...' কণ্ঠস্বরে আত্মমর্যাদার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল কভালিওভ, 'জানি না, আপনার কথাগুলোর অর্থ কী হতে পারে... এখানে সমস্ত ব্যাপারটা, মনে হয় জলের মতো পরিষ্কার...নাকি আপনি চান.. আরে আপনি যে আমারই নাক!'

নাক মেজরের দিকে তাকালেন, সামান্য ভ্রূকুটি করলেন।

'আপনি ভুল করলেন মশাই। আমি আমার নিজের গুণেই আমি। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে কোনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকার সঙ্গত কারণ নেই। আপনার ইউনিফর্মের বোতাম দেখে মনে হচ্ছে আপনি অন্য কোনো দপ্তরে কাজ করেন।'

এই বলে নাক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার প্রার্থনায় মন দিলেন।

কভালিওভ সব গুলিয়ে ফেলল, বুঝে উঠতে পারছিল-না কী করা যায়, সে কিছু ভাবতেও পারছিল না। এমন সময় একজন ভদ্রমহিলার পোশাকের মধুর খসখস আওয়াজ

www.pathagar.com

কানে এল; এগিয়ে এলেন এক বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা—সর্বাঙ্গে লেসের সজ্জা আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক তন্বী—পরনে সাদা পোশাক, মেয়েটির সুঠাম কটিদেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে, মাথায় ঈষৎ হলদেটে রঙের টুপি, ফুরফুরে পেস্ট্রির মতো হালকা। ডজনখানেক কলার আঁটা পোশাক পরনে, বিশাল জুলফিধারী এক দীর্ঘকায় ভৃত্য তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, নস্যিদানি খুলল।

কভালিওভ খানিকটা এগিয়ে এল, সে তার জামার কেম্ব্রিক কাপড়ের কলারটা টেনে বার করল, সোনার চেন-এ তার যে-সমস্ত সিল ঝুলছিল সেগুলো ঠিকঠাক করে নিল এবং এপাশে-ওপাশে হাসি ছড়াতে ছড়াতে মনোযোগ দিল তন্বী মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তখন বসন্তের ফুলের মতো সামনের দিকে সামান্য হেলে পড়ে তার স্বচ্ছপ্রায় অঙ্গুলিসমেত সাদা ধবধবে হাতটা উঠিয়ে কপালে ঠেকাচ্ছিল। কভালিওভ যখন টুপির আড়াল থেকে তার গোলগাল, উজ্জ্বল ধবধবে চিবুক আর প্রথম বসন্তের গোলাপের রঙ ছোপানো গালের একাংশ দেখতে পেল তখন তার হাসি আরও প্রশস্ত আকার ধারণ করল। কিন্তু হঠাৎ সে এক লাফে পিছিয়ে গেল, যেন ছেঁকা লেগেছে। তার মনে পড়ে গেল যে নাকের জায়গাটায় তার একেবারেই কিছু নেই, তার চোখে জল এসে গেল। সে ঘুরে দাঁড়াল ইউনিফর্মধারী ভদ্রলোকটিকে সোজাসুজি এই কথা বলার জন্য যে তিনি আসলে সরকারি পরামর্শদাতার ভেক নিয়েছেন, আসলে তিনি একটা ঠগ, ইতর, তিনি তারই পৈতৃক নাক বৈ আর কিছু নন।... কিন্তু নাক তখন আর সেখানে ছিলেন না; এই অবসরে তিনি সরে পড়েছেন, সম্ভবত আর কারও সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে।

ফলে কভালিওভ হতাশ হয়ে পড়ল। সে পিছু হটে বাইরে চলে এল, থামের সারি দেওয়া তোরণের নিচে থমকে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল কোথাও নাকের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। তার বেশ ভালোমতো মনে আছে যে নাকের টুপিতে ছিল পালক গোঁজা আর ইউনিফর্মটায় ছিল সোনালি জরির কাজ। কিন্তু ওভারকোটটা সে খেয়াল করে দেখে নি, তার জুড়িগাড়ির বা ঘোড়াগুলোর রঙও নয়, এমনকি তাঁর পেছনে কোনো ভৃত্য বা চাপরাশি ছিল কিনা তা-ও তার মনে নেই। তাছাড়া এত বেশিসংখ্যক জুড়িগাড়ি পেছনে সামনে ছুটে চলছিল এবং এত দ্রুত গতিতে যে—আলাদা করে তাদের চেনাও কঠিন; আর সেগুলোর মধ্য থেকে আলাদা করে চিনতে পারলেই-বা কী?—থামানোর কোনো সাধ্যও তার হবে না। দিনটা চমৎকার, রোদ ঝলমলে। নেভ্স্কি লোকে লোকারণ্য; পলিৎসেইস্কি ব্রিজ থেকে শুরু করে আনিচ্কভ ব্রিজ পর্যন্ত সর্বত্র ফুটপাথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মহিলাদের স্রোত—যেন পুরোদস্তুর ফুলের প্রবাহ। ঐ তো চলেছে তার পরিচিত এক কাছারির উপদেষ্টা, যাকে সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলে ডাকে, বিশেষত বাইরের লোকজনের সাক্ষাতে। ঐ তো ইয়ারিগিন, সিনেটের হেডক্লার্ক, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যে বস্টন খেলার সময় আটে খেললেই বাজি হেরে যায়। ঐ যে ককেশাসে কালেক্টরের খেতাব পাওয়া আরও এক মেজর—হাত নেড়ে কাছে আসতে বলছে...

'জাহান্নামে যাক!' কভালিওভ বলল। 'এই কোচম্যান, আমাকে সোজা নিয়ে চল পুলিশ কমিশনারের কাছে!'

কভালিওভ একটা সেকরা গাড়িতে চেপে বসে কোচম্যানের উদ্দেশে হাঁক পাড়ল, 'জলদি হাঁকাও!'

'পুলিশ কমিশনার আছেন কি?' বার-বারান্দায় পদার্পণ করে সে চেঁচিয়ে চলল।

'উঁহু নেই', দারোয়ান জবাব দিল, 'এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।'

'বোঝ কাণ্ড!'

www.pathagar.com

'হুঁ', দারোয়ান যোগ করল, 'এই তো কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেলেন। আর মিনিটখানেক আগে যদি আসতেন তাহলে বাড়িতে পেয়ে যেতেন।'

কভালিওভ মুখে রুমাল চাপা দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়ল, হতাশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'চালাও!'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কোচম্যান।

'সিধে হাঁকাও!'

'সিধে? তা কী করে হবে? ওখানে তো রাস্তা মোড় নিয়েছে : ডাইনে না বাঁয়ে?'

এই প্রশ্নে কভালিওভ থতমত খেয়ে গেল, সে আবার ভাবতে বসল বাধ্য হয়ে। তার যে রকম অবস্থা তাতে সবচেয়ে ভালো হয় পৌর পুলিশ দপ্তরে গিয়ে যোগাযোগ করলে, কারণ এমন নয় যে পুলিশের সঙ্গে এর কোনো সরাসরি সম্পর্ক আছে, কারণটা এই যে পুলিশ দপ্তরের হুকুম অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি জারি হওয়ার সম্ভাবনা। নাক যেখানে চাকরি করে বলে জাহির করছে সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত দাবি করাটা অবিবেচকের কাজ হবে, কেননা নাকের নিজের জবাব থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেছে যে এই লোকটির ন্যায়নীতির কোনো বালাই নেই, আর এক্ষেত্রে সে ডাহা মিথ্যা কথা বলে যেতে পারে, যেমন বলেছিল কিছুক্ষণ আগে, যখন সে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল যে কস্মিনকালেও মেজর কভালিওভকে সে দেখেনি। সুতরাং কভালিওভ কোচম্যানকে পৌর পুলিশ দপ্তরে যাবার প্রায় হুকুম দিয়েই বসেছিল, এমন সময় তার মাথায় এই চিন্তা খেলে গেল যে প্রথম সাক্ষাতেই যে ঠগ ও জোচ্চোরটা তার সঙ্গে এমন নির্লজ্জ ব্যবহার করে, দিব্যি সময়ের সুযোগ নিয়ে যে কোনো উপায়ে শহর থেকে সটকেও পড়তে পারে— আর তা যদি হয় তবে সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হবে কিংবা চললেও, তা চলবে অন্তত এক মাস ধরে। এই সময় হঠাৎ করেই সে যেন আকাশ থেকে প্রত্যাদেশ পেল। স্থির করল সরাসরি খবরের কাগজের অফিসে যাবে এবং সময় থাকতে যাবতীয় লক্ষণাদির বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে, যাতে যে কেউ ওটা দেখামাত্র নাকটাকে উদ্ধার করে তার কাছে এনে হাজির করতে পারে কিংবা অন্তত হদিশ দিতে পারে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কোচম্যানকে খবরের কাগজের অফিসের দিকে গাড়ি চালাতে হুকুম দিল এবং সারা রাস্তা ধরে কোচম্যানের পিঠে কিল ঘুষি বর্ষণ করতে করতে বলে চলল : 'জলদি চালা ইতর! জলদি, জলদি ঠগ কোথাকার!' 'ওঃ বাবু!' বলতে বলতে কোচম্যান মাথা ঝাঁকাতে লাগল, রাশ আলগা করে দিল তার ঘোড়ার, যেটার গায়ে লোমশ বলোনিজ কুকুরের মতো লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া পশম। সেকরা গাড়ি থামলে কভালিওভ হাঁপাতে হাঁপাতে, ছুটতে ছুটতে এসে প্রবেশ করল একটা ছোটো আকারের রিসেপ্‌শন রুমে, সেখানে পুরনো টেইল-কোট পরনে, চশমা-নাকে এক পক্বকেশ কেরানি দাঁতে পালকের কলম কামড়ে ধরে টেবিলের পাশে বসে সামনে রাখা একগাদা তামার পয়সা গুনছিল।

'এখানে কে বিজ্ঞাপন নেন?' কভালিওভ চেঁচিয়ে বলল। 'এই যে, নমস্কার!'

'নমস্কার', পক্বকেশ কেরানিটি এক মিনিটের জন্য চোখ তুলে কথাটা বলেই আবার সামনে রাখা পয়সার স্তূপের ওপর চোখ নামাল।

'আমি কাগজে ছাপাতে চাই...'

'যদি কিছু মনে না করেন...দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন', ডান হাতে কাগজের উপর সংখ্যা লিখতে লিখতে এবং বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে পাশে রাখা অ্যাবাকাসের ঘুঁটির সারিতে দুটো ঘুঁটি সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল।

www.pathagar.com

লেস লাগানো পোশাক পরনে এক ভৃত্যগোছের লোক, যার চেহারা দেখে মনে হয় কোনো অভিজাত বাড়িতে কাজ করে, দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের পাশে; লোকটার হাতে ধরা ছিল একটা চিরকুট। সে তার মিশুকে স্বভাবের পরিচয় দেওয়া শিষ্টাচারসম্মত বিবেচনা করে বলল, 'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না স্যার, কুকুরটার দাম একটা আধুলিও হবে না, মানে আমি হলে তো ওটার জন্যে আটটা তামার পয়সাও দিতাম না; কিন্তু রানি-মা কুকুরটাকে এমন ভালোবাসেন, যে দেখুন তার ফল : যে ওটার সন্ধান দিতে পারবে তাকে একশ' রুব্‌ল পুরস্কার! আর যদি ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, যেমন এই এখন আপনার-আমার মধ্যে কথা হচ্ছে, তাহলে বলব মানুষের রুচির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই : শিকারিদের কথাই ধরুন-না কেন, কোনো শিকার খোঁজার বা শিকারের পেছনে তাড়া করার মতো কুকুরের জন্য তারা পাঁচশ', হাজার দিতেও কার্পণ্য করবে না—কুকুর ভালো জাতের হলেই হল।'

কেরানি মহোদয় গম্ভীর ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল আর সেইসঙ্গে হাতে করে আনা চিরকুটটিতে ক'টা অক্ষর আছে তা-ও গুনে চলছিল। তার আশেপাশে চিরকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বহুসংখ্যক বৃদ্ধা, দোকানকর্মী ও চৌকিদার শ্রেণীর লোকজন। কোনোটাতে প্রকৃতিস্থ স্বভাবচরিত্রের এক কোচম্যান সেবাদান-প্রার্থী; কোনোটাতে ছিল ১৮১৪ সালে প্যারিস থেকে আনা স্বল্পকাল ব্যবহৃত এক গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন; কোনোটাতে ধোবির কাজে অভ্যস্ত, তবে অন্যান্য কাজেরও উপযোগী উনিশ বছর বয়স্কা ভূমিদাস-কন্যা সেবা-প্রার্থিনী; এ-ছাড়াও বিজ্ঞাপনের মধ্যে ছিল একটা স্প্রিং-ছাড়া মজবুত সেকরা গাড়ি, ছাইরঙা চক্করওয়ালা সতের বছর বয়স্ক তরুণ তেজি ঘোড়া, লন্ডন থেকে প্রাপ্ত শালগম ও মুলোর নতুন বীজ; দুটো আস্তাবল ও চমৎকার বার্চ অথবা ফারগাছের বাগান করার উপযোগী প্রশস্ত জমিসমেত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন বাগানবাড়ি; একটা বিজ্ঞাপনে আবার ছিল পুরনো জুতোর সোল ক্রয়েচ্ছুদের প্রতি আহ্বান—প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে তিনটের মধ্যে নিলামঘরে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের। গোটা দলটা যে-ঘরে এসে জড় হয়েছিল সেটা ছিল ছোটো, ঘরের বাতাস ছিল দারুণ ভারি; কিন্তু সরকারি কালেক্টর কভালিওভের পক্ষে কোনো গন্ধ টের পাবার উপায় নেই, যেহেতু সে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছে, তা ছাড়া খোদ তার নাকটাই, যা দিয়ে সে আঘ্রাণ নেবে—ঈশ্বর জানেন, এখন কোথায়।

'মশাই শুনছেন? আমার আর্জিটা... বড় দরকারি', অধৈর্য হয়ে শেষকালে সে বলে ফেলল।

'এক্ষুনি, এক্ষুনি! দু রুব্‌ল তেতাল্লিশ কোপেক! এক মিনিট! এক রুব্‌ল চৌষট্টি কোপেক!' বুড়ি আর দারোয়ান শ্রেণীর লোকদের মুখের ওপর চিরকুটগুলো ছুড়ে দিতে দিতে পক্বকেশ কেরানি মহোদয় বলে যাচ্ছিলেন। 'আপনার কী চাই?' অবশেষে কভালিওভের উদ্দেশে সে বলল।

'আমার আর্জিটা হল এই যে...' 'এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে যাকে প্রতারণা না জুয়াচুরি কী বলব, এখনও আমি কোনোমতে বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, কেবল এই কথাগুলো ছাপিয়ে দিন যে, দুর্বৃত্তটিকে যে-ব্যক্তি ধরে আমার কাছে এনে হাজির করতে পারবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।'

'আপনার নাম, পদবি জানতে পারি কি?'

'না, নাম-টামে কী দরকার? ও সব আমি প্রকাশ করতে পারব না। সরকারি পরামর্শদাতা চেখতারিওভের স্ত্রী, স্টাফ অফিসারের স্ত্রী পালাগেইয়া গ্রিগরিয়েভ্‌না পদ্‌তোচিনা...এ-রকম বহু লোকজন আমার চেনা-পরিচিত। ঈশ্বর না-করুন, হঠাৎ যদি

www.pathagar.com

জানাজানি হয়ে যায়! আপনি স্রেফ লিখুন না-কেন সরকারি কালেক্টর, কিংবা আরও ভালো হয় যদি লেখেন জনৈক মেজর পদাধিকারী।'

'যে পালিয়েছে সে কি আপনার চাকর-বাকরদের কেউ?'

'আরে না না! তাহলে তো বড় ধরনের প্রতারণা বলা যেত না এটাকে! আমার কাছ থেকে পালিয়েছে... নাসিকা...'

'হুম্! বড় অদ্ভুত নাম! তা এই নাসিকা বাবাজিটি কি আপনার প্রচুর টাকা মেরেছে?'

'নাসিকা হল গিয়ে...আপনি যা ভাবছেন তা নয়! নাক, আমার একেবারে নিজস্ব নাক... যাকে বলে, সেটা খোয়া গেছে, কোথায় জানি না। শয়তানের কারসাজি!'

'কিন্তু কীভাবে খোয়া গেল? কোথায় যেন একটা গোলমাল ঠেকছে, ভালোমতো বুঝতে পারছি না।'

'কীভাবে চুরি গেল সেটা আমি আপনাকে বলতে পারছি না; তবে আসল কথা হল যে সে এখন শহরের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজেকে সরকারি পরামর্শদাতা বলে জাহির করছে। তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এই মর্মে বিজ্ঞাপন ছাপান যে ওটাকে ধরতে পারলে যেন বিন্দুমাত্র দেরি না-করে, অনতিবিলম্বে আমার কাছে এনে হাজির করা হয়। আপনিই বিচার করে দেখুন শরীরের এমন একটা দৃষ্টিগোচর অংশ ছাড়া আমার চলবে কী করে? এটা তো আর আমার পায়ের কড়ে আঙুল নয় যে পা বুটজুতোর ভেতরে গলিয়ে দিলাম—ব্যস, আঙুল না-থাকলেও কারও জানার উপায় নেই। আমি বৃহস্পতিবার-বৃহস্পতিবার সরকারি পরামর্শদাতা চেখ্‌তারিওভের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই, স্টাফ অফিসারের স্ত্রী পালাগেইয়া গ্রিগরিয়েভনা পদতোচিনার কাছেও যাই—তাঁর আবার বেশ সুন্দরী একটি মেয়ে আছে—দু'জনের সঙ্গেই আমার দারুণ দহরম-মহরম। তাই বলি কি আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন, এখন আমি কী করে...কী করে এখন আমি তাঁদের কাছে যাই।'

কেরানি যেভাবে শক্ত করে ঠোঁট কামড়াল তাতে বোঝা গেল যে সে সত্যি সত্যি দারুণ ভাবনায় পড়ে গেছে।

'না, এ ধরনের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ছাপানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়', অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে সে বলল।

'কেন? কী কারণে?'

'পারব না, বললাম তো। পত্রিকার সুনাম নষ্ট হতে পারে। সকলেই যদি লিখতে শুরু করে যে তাদের নাক খোয়া গেছে তা হলে... অমনিতেই লোকে বলে যে পত্রিকায় অনেক আজেবাজে, মিথ্যে গুজব ছাপানো হয়।'

'কিন্তু এটা আজেবাজে হল কী করে শুনি? আমার তো মনে হয় সে রকম কিছুই এর মধ্যে নেই।'

'নেই, সেটা আপনার মনে হচ্ছে। অথচ এই ধরুন-না কেন গত সপ্তাহের ঘটনাটা। আপনি যেমন এসেছেন ঠিক সেইভাবে একজন সরকারি কর্মচারী এল একটা চিরকুট নিয়ে, হিসাব করে দাঁড়াল দুই রুব্‌ল তিয়াত্তর কোপেক, আর গোটা বিজ্ঞাপনের বক্তব্যটা হল এই যে কালো লোমওয়ালা এক পুডল্ কুকুর হারিয়েছে। মনে হতে পারে এতে আর কী আছে? কিন্তু ব্যাপারটা গড়াল মানহানির মামলায় : আসলে এই পুড্‌ল ছিল এক ক্যাশিয়ার—কোন প্রতিষ্ঠানের তা মনে করতে পারছি না।'

'কিন্তু আমি তো আর কোনো পুড্‌ল সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছি না, বিজ্ঞাপন দিচ্ছি আমার নিজের নাক সম্পর্কে : অর্থাৎ, বলতে গেলে খোদ নিজের সম্পর্কে।'

www.pathagar.com

'না, এ ধরনের বিজ্ঞাপন আমি কোনোমতেই ছাপাতে পারি না।'

'আমার নাক সত্যি সত্যিই খোয়া গেলেও নয়।'

'খোয়া যদি গিয়ে থাকে সে হল গিয়ে ডাক্তারের কাজ। শুনেছি এমন লোকও আছে যারা যে-কোনো রকম নাক বসাতে পারে। কিন্তু সে যাক গে, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি বেশ রগুড়ে লোক, লোকজনের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে ভালোবাসেন।'

'ঈশ্বরের পবিত্র নামের দিব্যি! ব্যাপারটা যখন এতদূর এসে ঠেকেছে, তখন দেখাতেই হচ্ছে।'

'ঝামেলায় কাজ কী!' কেরানি নস্যি টানতে টানতে বলে চলল, 'অবশ্য তেমন ঝামেলা যদি মনে না-করেন, তাহলে একবার দেখতে পেলে মন্দ হত না।'

সরকারি কালেক্টর কভালিওভ মুখের উপর থেকে রুমাল সরিয়ে নিল।

'সত্যি অদ্ভুত তো!' কেরানি বলল, 'জায়গাটা একেবারে লেপাপোঁছা, যেন সবে সেঁকা একটা চাপাটি। হ্যাঁ এমনই সমান যে বিশ্বাস করা যায় না!'

'তাহলে, এখনও কি আপনি তর্ক করবেন? আপনি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন যে বিজ্ঞাপনটা না-ছাপালে চলছে না। আমি আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব; এই উপলক্ষে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় আমি বড়ই আনন্দিত—নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করছি...'

এ থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে মেজর এবারে খানিকটা খোসামোদের আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'ছাপানোটা অবশ্যই তেমন কঠিন ব্যাপার নয়', কেরানি বলল, 'তবে এতে আপনার কোনো লাভ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি নেহাৎই এ ব্যাপারে কিছু করতে চান তাহলে বরং যার কলমের জোর আছে এমন কাউকে দিয়ে বিষয়টিকে অসাধারণ প্রকৃতির ঘটনা বলে তুলে ধরুন, প্রবন্ধটা 'উত্তরের মধুকর' কাগজে ছাপতে দিন' (এই বলে সে আরও এক টিপ নস্যি নিল), 'যুবসম্প্রদায়ের উপকারের জন্য' (বলতে বলতে সে নাক মুছল), 'কিংবা অমনিতেই সকলের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য।'

সরকারি কালেক্টর সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল। সে চোখ নামাল খবরের কাগজের পাতার উপরে, জায়গাটা থিয়েটারের বিজ্ঞপ্তিতে ভরা—সেখানে এক এক আকর্ষণীয় অভিনেত্রীর নাম চোখে পড়তে তার মুখে প্রায় হাসি-হাসি ভাব ফুটে উঠল, তার হাতও চলে গেল পকেটে, পাঁচ রুবলের নোট কাছে আছে কিনা দেখার উদ্দেশ্যে, যেহেতু কভালিওভের মতে স্টাফ অফিসারদের বসা উচিত গদিওয়ালা সিটে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নাকের কথাটা মনে পড়তেই সব বরবাদ হয়ে গেল।

কেরানিটি নিজেও যেন কভালিওভের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল। কভালিওভের দুঃখ অন্তত কিঞ্চিৎ পরিমাণেও লাঘবের বাসনায় সে গুটিকয়েক কথায় তার সমবেদনা জানানো সৌজন্যমূলক বলে গণ্য করল, 'সত্যি কথা বলতে গেলে কী, আপনার জীবনে যে এ-রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। এক টিপ নস্যি নেওয়া কি আপনার পক্ষে ভালো হবে না? এতে মাথার যন্ত্রণা আর মনমরা ভাবটা ছেড়ে যায়; এমনকি অর্শের পক্ষেও এটা ভালো।'

বলতে বলতে কেরানিটি কভালিওভের সামনে নস্যিদানি ধরে টুপি-পরিহিতা কোনো-এক মহিলার প্রতিকৃতি-আঁকা ঢাকনাটা বেশ কায়দা করে ঘুরিয়ে নিচে সরিয়ে দিল।

এহেন হঠকারিতায় কভালিওভের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

www.pathagar.com

'আমি ভেবে পাই না, এ নিয়ে আপনি রসিকতা করেন কী করে', সে রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না নস্যি যেখানে দিয়ে টানব সেই জিনিসটাই আমার নেই? জাহান্নামে যাক আপনার নস্যি! এই অবস্থায় ওটার দিকে তাকানোরও প্রবৃত্তি নেই আমার—আপনার ঐ জঘন্য বেরেজিন্স্কি মার্কা তো দূরের কথা, যদি খোদ রাপে এনে দিতেন তা হলেও নয়।'

এই বলে সে দারুণ বিরক্ত হয়ে খবরের কাগজের অফিস বেরিয়ে রওনা দিল পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের উদ্দেশে। লোকটি ছিল চিনির পরম ভক্ত। তার বাড়িতে পুরো সামনের ঘরটা, যেটা আবার খাবার ঘরও বটে, চিনির ডেলায় সাজানো—ডেলাগুলোকে বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে নানান সময়ে উপঢৌকন দিয়েছে ব্যবসায়ীরা। বাড়ির রাঁধুনি এই সময় সুপারিন্টেন্ডেন্টের পা থেকে তার আনুষ্ঠানিক জ্যাক-বুট জোড়া খুলছিল; তলোয়ার এবং আর সব সামরিক উপকরণ শান্তভাবে ঘরের এ কোণায় ও কোণায় ঝুলছিল, আর ভয়ঙ্কর তেকোণা টুপিটা নিয়ে খেলা করছিল তার তিন বছরের ছেলে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এখন যুদ্ধবিপর্যস্ত, সামরিক জীবনের পর শান্তিসুখ উপভোগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কভালিওভ যখন তার কাছে এসে উপস্থিত হল ঠিক তার সামান্য আগে সে হাত-পা টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে কঁকিয়ে উঠে বলেছিল, 'আঃ, ঘণ্টাদুয়েক আরামসে ঘুম দেওয়া যাবে!' তাই অনুমান করা যেতে পারে যে কালেক্টরের আগমন ছিল সম্পূর্ণ অসময়োচিত; আমার তো মনে হয় ঐ সময় সে যদি অন্তত কয়েক পাউন্ড চা কিংবা খানিকটা বনাত কাপড়ও উপঢৌকন হিসেবে আনত তাহলেও তেমন একটা সাদর অভ্যর্থনা পেত না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিল যাবতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের পরম উৎসাহদাতা, তবে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত ব্যাংক নোট। 'জিনিসের মতো জিনিস বটে', সে সচরাচর বলত, 'এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছুই নেই : খাওয়ানোর দরকার নেই, জায়গা অল্প লাগে, পকেটে সবসময় জায়গা হয়ে যায়, পড়ে গেলেও ভাঙে না।'

সুপরিন্টেন্ডেন্ট শুষ্ককণ্ঠে কভালিওভকে অভ্যর্থনা জানাল, বলল যে মধ্যহ্নভোজের পর তদন্ত চালানোর সময় নয়, স্বয়ং প্রকৃতির নির্দেশ এই যে পেট পুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করা উচিত। (এ থেকে কালেক্টর বুঝতে পারল যে প্রাচীন জ্ঞানীদের বাণী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের অজানা নয়), তাছাড়া কোনো ভালো লোকের নাক কেউ ছিনিয়ে নেয় না, আর দুনিয়ার মেজর অনেক রকমের আছে, এমন আছে যাদের পরনে একটা ভদ্রস্থ জামা পর্যন্ত নেই, যারা অস্থানে-কুস্থানেও যাতায়াত করে।

রেখে ঢেকে নয়, সরাসরি মুখের ওপর কথা! এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কভালিওভ ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর লোক। তার নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলা হোক-না কেন সে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু তার পদ বা খেতাব নিয়ে লোকে কিছু বলবে এটা সে কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারে না। তার মনে হল নাট্যাভিনয়ে মেজরের নিচের শ্রেণীর সৈন্যদের নিয়ে যা খুশি দেখানো হোক-না কেন তাতে তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু স্টাফ অফিসারের ওপর আক্রমণ করা কিছুতেই সহ্য করা চলে না। পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের অভ্যর্থনায় সে এমন হতভম্ব হয়ে গেল যে মাথা ঝাঁকিয়ে মর্যাদাব্যঞ্জক স্বরে, দুই হাত সামান্য ছড়িয়ে সে বলল : 'আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার পক্ষ থেকে এ ধরনের অপমানজনক মন্তব্যের পর আমার আর কিছুই বলার নেই।' সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল।

বাড়িতে যখন সে ফিরে এল তখন নিজের পায়ে প্রায় কোনো সাড়াই পাচ্ছিল না। ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এতক্ষণের অনর্থক খোঁজাখুঁজির পর নিজের

www.pathagar.com

ফ্ল্যাটটাকে তার কাছে মনে হতে লাগল ভয়ানক কুৎসিত আর বিষণ্ণ ধরনের। সামনের ঘরটাতে প্রবেশ করতে গিয়ে সে দেখতে পেল যে চাকর ইভান ছোপ-ধরা চামড়ার কোচে চিত হয়ে শুয়ে ছাদের কড়িকাঠ লক্ষ্য করে থুতু ছুড়ে, বেশ সাফল্যের সঙ্গে বারবার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করছে। লোকটার এই ঔদাসীন্যে কালেক্টর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, টুপি দিয়ে তার কপালে এক ঘা কষিয়ে বলল : 'শুয়োর কোথাকার, সব সময় আজেবাজে কাজ!'

ইভান তৎক্ষণাৎ তার জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সাঁ করে ছুটে এল প্রভুর গা থেকে আংকানটা খোলার জন্য।

নিজের ঘরে প্রবেশ করে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মেজর গদি-আঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল, অবশেষে পর পর কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল :

'হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! কেন এই দুর্ভাগ্য? যদি হাত কিংবা পা যেত, সে-ও ছিল এর চাইতে ভালো; কান যদি যেত সেটা খারাপই হত, কিন্তু তা-ও সহ্য করা যেত; কিন্তু নাক ছাড়া মানুষ? কী বলা যায় তাকে?—পশু নয়, পাখি নয়, মানুষও নয়! স্রেফ তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার বস্তু! আর তা-ও যদি কাটা যেত যুদ্ধে কিংবা ডুয়েলে, কিংবা আমাদের নিজের কোনো দোষে; কিন্তু দেখ, খোয়া গেল নাকটা বিনা কারণে, বেফায়দা, ঝুটমুট!... না, না, এ হতে পারে না', খানিকটা ভেবে নিয়ে সে যোগ করল। 'নাক খোয়া যাওয়া এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সম্ভবত আমি স্বপ্ন দেখছি, নয়ত নেহাৎই আমার মনের ভ্রান্তি; এমনও তো হতে পারে যে জলের বদলে আমি ভুলক্রমে খেয়ে ফেলেছি ভোদ্‌কা, যে ভোদ্‌কা আমি দাড়ি কামানোর পর চিবুকে ঘষি। বোকা ইভান বোতলটা উঠিয়ে রাখেনি, সম্ভবত আমি খেয়ে ফেলেছি সবটুকু।'

সে যে মাতাল নয় এ বিষয়ে সত্যি সত্যি নিশ্চিত হওয়ার জন্য মেজর নিজের গায়ে এত জোরে চিমটি কাটল যে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল নিজেই। এই যন্ত্রণার ফলে তার সম্পূর্ণ প্রত্যয় হল যে সে সক্রিয় এবং জাগ্রত অবস্থায়ই আছে। ধীরে ধীরে আয়নার দিকে এগিয়ে গেল এবং প্রথমে এই আশায় চোখ কোঁচকাল যে নাকটা হয়তো যথাস্থানে দেখা গেলেও যেতে পারে; কিন্তু পর মুহূর্তেই এক লাফে পিছিয়ে বলে উঠল :

'ওঃ কী বিদঘুটে দৃশ্য!'

ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই দুর্বোধ্য। বোতাম, রুপোর চামচ, ঘড়ি কিংবা ঐ ধরনের কিছু জিনিস খোয়া গেলে না-হয় একটা মানে হয়, কিন্তু গেল তো গেল—এ কী খোয়া গেল! তা-ও আবার কিনা নিজের ফ্ল্যাটে!... মেজর কভালিওভ সমস্ত পরিস্থিতি মনে মনে বিবেচনা করে এটাই সত্যের অনেকটা কাছাকাছি বলে অনুমান করল যে এর জন্য সম্ভবত স্টাফ অফিসার পদতোচিনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়—ভদ্রমহিলার ইচ্ছে ছিল সে যেন তার মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে তার নিজেরও মন্দ লাগত না কিছু চূড়ান্ত কোনো কথা দেওয়ার ব্যাপারটা সে পরিহার করে এসেছে। স্টাফ অফিসারের পত্নী যখন কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছে তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানালেন তখন সে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিল; সবিনয়ে জানাল যে তার বয়স এখনও কম, তার আরও পাঁচ বছর চাকরি করা দরকার যাতে বয়স পুরোপুরি বেয়াল্লিশ হয়। আর সেই কারণে স্টাফ অফিসারের পত্নী সম্ভবত প্রতিহিংসাবশত তার সর্বনাশ করার মতলব এঁটেছেন, হয়তো কোনো ডাইনি-টাইনির সাহায্য নিয়েছেন, কেননা নাকটা যে কাটা গেছে এটা কোনোমতেই ভাবা যাচ্ছে না। এছাড়া তার ঘরে কেউ আসেনি, নাপিত ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ তার দাড়ি কামিয়েছে বটে, কিন্তু সে তো বুধবারে। গোটা বুধবার ধরে, এমনকি পুরো বিষ্যুদবারটাও তার নাক অক্ষত ছিল—এটা তার মনে আছে এবং বেশ

www.pathagar.com

ভালোভাবেই মনে আছে; তাছাড়া সে রকম হলে তো ব্যথাই টের পেত সে, আর নিঃসন্দেহে কোনো ক্ষত অত তাড়াতাড়ি শুকোতোও না এবং চাপাটির মতো অমন লেপাপোঁছাও হত না। সে মনে মনে মতলব আঁটতে লাগল কী করা যায়—স্টাফ অফিসারের স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা ঠুকবে, নাকি নিজেই তার বাসায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। দরজার সমস্ত ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলোর ঝলক এসে ঘরে ঢুকল—বোঝা গেল যে সামনের ঘরে ইভান ইতোমধ্যেই মোমবাতি জ্বেলেছে। ফলে ভাবনায় ছেদ পড়ল মেজরের। অচিরেই মোমবাতি আগ বাড়িয়ে ধরে সারা ঘর উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করে আবির্ভাব ঘটল ইভানের। কভালিওভের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল রুমাল তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা চাপা দেওয়া যেখানে গতকালও বিরাজ করছিল তার নাক, যাতে কর্তার এই অদ্ভুত অবস্থা দেখে বোকা লোকটার মুখ হাঁ না হয়ে যায়।

ইভান তার নিজের খুপরিতে ফিরে যেতে না-যেতে সামনের ঘরে শোনা গেল অপরিচিত কণ্ঠস্বর, কে যেন জিজ্ঞেস করল :

'সরকারি কালেক্টর কভালিওভ এখানে থাকেন কি?'

'ভেতরে আসুন, মেজর কভালিওভ এখানে', ঝট্ করে লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলতে খুলতে কভালিওভ বলল।

প্রবেশ করল এক পুলিশ কর্মচারি। চেহারাটা সুন্দর, দু'পাশের জুলপিজোড়া না একেবারে ফ্যাকাশে, না গাঢ় রঙের, গাল বেশ ভরাট—এ হল সেই পুলিশ কর্মচারীটি, কাহিনীর শুরুতে যাকে আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ইসাকিয়েভ্স্কি ব্রিজের প্রান্তে।

'যদি কিছু মনে না-করেন, আপনিই কি নাক হারিয়েছেন?'

'হাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'ওটা এখন পাওয়া গেছে।'

'বলেন কী?' মেজর কভালিওভ চেঁচিয়ে উঠল। আনন্দে তার বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। সে চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল তার সম্মুখে দণ্ডায়মান দারোগার দিকে—দারোগা সাহেবের ফোলাফোলা ঠোঁট আর গালের ওপর মোমবাতির কাঁপা কাঁপা উজ্জ্বল আলো নাচছে। 'কী ভাবে পেলেন?'

'অদ্ভুত ঘটনাক্রমে : ওটাকে প্রায় পথেই পাকড়াও করি। একটা গাড়িতে চেপে রিগায় চলে যাবার তাল করছিল। পাসপোর্টটা ছিল অনেক আগের, এক সরকারি কর্মচারীর নামে। আর অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে গোড়ায় আমি নিজেও ওকে কোনো ভদ্রলোক বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার সঙ্গে চশমা ছিল, তাতেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে ওটা হল নাক। আমার আবার দৃষ্টিটা ক্ষীণ কিনা, আপনি যদি আমার সামনাসামনি দাঁড়ান তাহলে আমি কেবল দেখতে পাব যে আপনার মুখ আছে, কিন্তু না নাক, না দাড়ি কিছুই ঠাহর করতে পারব না। আমার শাশুড়ি, মানে আমার স্ত্রীর মা-ও কিছুই দেখতে পান না।'

উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে পড়ল কভালিওভ।

'এটা কোথায়? কোথায় আছে? আমি এক্ষুনি যাব।'

'অধীর হবেন না। ওটা আপনার দরকার জেনেই আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আর অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে এ কাজের নাটের গুরু ভজ্নেসেন্স্কায়া স্ট্রিটের এক ঠক নাপিত, যে এখন হাজতবাস করছে। এই দু'দিন আগেও একটা দোকান থেকে সে এক ডজন বোতামের একটা পাতা সরিয়েছে। আপনার নাক যেমন ছিল অবিকল তেমনি আছে।'

www.pathagar.com

এই বলে পুলিশ ইনস্পেক্টর পকেটে হাত গলিয়ে বার করল কাগজে মোড়া নাক।

'হ্যাঁ এটাই!' কভালিওভ চেঁচিয়ে উঠল। 'আরে এটাই তো! আসুন, আজ আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন।'

'খেতে পারলে পরম কৃতার্থ বোধ করতাম, কিন্তু কিছুতেই পারছি না : আমাকে আবার এখান থেকে যেতে হবে সংশোধনাগারে। ... সমস্ত জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে।... আমার বাড়িতে আমাদের সঙ্গে বাস করেন শাশুড়ি, মানে আমার স্ত্রীর মা, এ-ছাড়া আছে ছেলেপুলে; বিশেষত বড়টা রীতিমতো সম্ভাবনাপূর্ণ : বড় বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু পড়াশুনা চালানোর কোনোরকম সঙ্গতিই নেই।'

ইঙ্গিতটা আঁচ করতে পেরে কভালিওভ টেবিল থেকে একটা দশ রুবলের নোট নিয়ে ইনস্পেক্টরের হাতে গুঁজে দিল। ইনস্পেক্টর নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন, আর ঠিক পরক্ষণেই কভালিওভ শুনতে পেল রাস্তায় তার কণ্ঠস্বর—চাষাভুষো শ্রেণীর একটা বোকা লোক গাড়ি নিয়ে সোজা বুলভারে উঠে পড়ায় তাকে সে উত্তমমধ্যম দিচ্ছে।

পুলিশ ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর কালেক্টরটি কয়েক মিনিট কেমন যেন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ডুবে রইল। অপ্রত্যাশিত আনন্দে সে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, দেখা এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা ফিরে পেতে তার বেশ কয়েক মিনিট লেগে গেল। সে সন্তর্পণে দুই হাতে অঞ্জলি পেতে উদ্ধারপ্রাপ্ত নাকটা সেখানে রেখে সেটাকে মনোযোগ দিয়ে আরও একবার দেখল।

'হ্যাঁ ঠিকই, এটাই বটে!' মেজর কভালিওভ বলল। 'হ্যাঁ এই তো বাঁ দিকে সেই ফুসকুড়িটা, যেটা গতকাল উঠেছিল।'

মেজর আনন্দে প্রায় হেসেই ফেলল।

কিন্তু পৃথিবীতে কোনো কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়, আর এই কারণেই আনন্দও পরবর্তী মুহূর্তে প্রথম মুহূর্তের মতো গভীর থাকে না; তারও পরের মুহূর্তে হয়ে আসে আরও ক্ষীণ এবং অবশেষে মনের সাধারণ অবস্থার সঙ্গে অলক্ষিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়—জলের বুকে ঢিল পড়লে যে বৃত্তাকার লহরির সৃষ্টি হয় তা যেমন শেষ পর্যন্ত মসৃণ জলপৃষ্ঠে মিশে যায় ঠিক তেমনি। কভালিওভ এসব কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে আর তখনই তার চৈতন্য হল যে ব্যাপারটা এখনও মিটে যায়নি : নাক খুঁজে পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তাকে যে সাঁটতে হবে, যথাস্থানে লাগাতে হবে!

'কিন্তু যদি আটকানো না-যায় তাহলে?'

নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন করার পর মেজর ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

একটা দুর্বোধ্য আতঙ্ক এসে ভর করল তার ওপর। সে ছুটে গেল টেবিলের দিকে, নাকটা যাতে কোনোমতেই বাঁকা বসান না-হয় তার জন্য সে আয়না টেনে বের করল। হাত কাঁপছিল তার। সাবধানে, হুঁশিয়ার হয়ে নাকটাকে সে আগেকার জায়গায় বসাল। ওঃ কী সাঙ্ঘাতিক! নাক এঁটে থাকছে না! সে ওটাকে মুখের সামনে নিয়ে এল, মুখের সামান্য ভাপ দিয়ে একটু গরম করে নিয়ে আবার দুই গালের মাঝখানকার সমতল জায়গায় এনে ধরল, কিন্তু নাক কিছুতেই নিজের জায়গায় থাকছে না।

'এই! এই! লেগে থাক্, আহাম্মক কোথাকার!' ধমকে উঠল সে। কিন্তু নাক তখন কাঠের টুকরোর মতো, টেবিলের উপর পড়ে এমন এক বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ করল যেন একটা ছিপি। খিঁচুনির ফলে মেজরের মুখ বেঁকে গেল। 'তা হলে কি ওটা জোড়া লাগবেই না?' ভয় পেল মেজর। কিন্তু কতবারই-না সে তাকে যথাস্থানে রাখতে গেল, সব চেষ্টা বৃথা।

www.pathagar.com

ঐ বাড়িরই দোতলায় সবচেয়ে ভালো ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন এক ডাক্তার। ইভানকে ডেকে মেজর তাঁকে আনতে পাঠাল। এই ডাক্তারটি বিশিষ্ট চেহারার পুরুষ, চমৎকার কালো কুচকুচে জুলফি, তাঁর ঘরনিটিও তাজা স্বাস্থ্যবতী। তিনি সকালে টাটকা আপেল খান, রোজ সকালে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে গার্‌গল্‌ করেন এবং পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে মুখের ভেতরটা অসাধারণ পরিষ্কার রাখেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন। কত দিন যাবত দুর্ঘটনাটা ঘটেছে জিজ্ঞেস করার পর ডাক্তার চিবুক ধরে মেজর কভালিওভের মাথা উপরে তুললেন এবং আগে যেখানে নাক ছিল ঠিক সেই জায়গাটায় বুড়ো আঙুল দিয়ে এমন টুসকি মারলেন যে মেজর মাথাটা ঝটকা মেরে পেছনে হেলাতে বাধ্য হল, ফলে মাথার পেছন দিকটা ঠুকে গেল দেয়ালে। চিকিৎসক বললেন ওটা কিছু নয়, বলে দেয়াল থেকে খানিকটা সরে আসতে পরামর্শ দিলেন। এরপর মাথাটা প্রথমে ডান দিকে হেলাতে নির্দেশ দিয়ে যেখানে আগে নাক ছিল সেই জায়গা স্পর্শ করে বললেন : 'হুম্‌!' অতঃপর তাকে ইঙ্গিত করলেন বাঁ দিকে মাথা হেলাতে এবং আবার বললেন 'হুম্‌!' আর পরিশেষে বুড়ো আঙুল দিয়ে আবার এমন একটা টুসকি মারলেন যে দাঁত দেখতে গেলে ঘোড়া যেমন করে, সেইভাবে মেজর কভালিওভ মাথাঝটকা দিল। এহেন পরীক্ষার পর চিকিৎসক মাথা নাড়িয়ে বললেন :

'না, সম্ভব নয়। আপনি বরং এই অবস্থায়ই থাকুন, কেননা কিছু করতে গেলে আরও খারাপ হতে পারে। ওটাকে লাগানো যে যায় না এমন নয়; আমি হয়তো এক্ষুনি লাগিয়ে দিতাম, কিন্তু আমি আপনাকে সত্যি করে বলছি, এতে আপনার খারাপই হবে।'

'চমৎকার কথা! নাক ছাড়া আমার চলবে কী করে শুনি?' কভালিওভ বলল। 'এখন যেমন আছে এর চেয়ে খারাপ তো আর কিছু হতে পারে না! এটা যে ছাই কী, তা একমাত্র শয়তানই জানে! এরকম যাচ্ছেতাই অবস্থায় কোথায় আমি মুখ দেখাব? আমার ভালো ভালো চেনা-পরিচিত লোকজন আছে; এই তো আজই দুটো বাড়ির সান্ধ্য আসরে আমার যাওয়া দরকার। অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ : সরকারি পরামর্শদাতা চেখ্‌তারিতের স্ত্রী, স্টাফ অফিসারের স্ত্রী পদতোচিনা... যদিও তাঁর বর্তমান আচরণে পর পুলিশের মাধ্যমে কিছু করা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার কাছে মিনতি করছি', কভালিওভ কাতর কণ্ঠে বলল, 'কোনো উপায় কি নেই? কোনো রকম আটকে দিন, ভালো হোক খারাপ হোক, লেগে থাকলেই হল; তেমন বিপদ দেখলে হাত দিয়ে সামান্য ঠেলে ধরে রাখতেও আমি রাজি। তাছাড়া আমি নাচিও না, সুতরাং অসাবধানতাবশত বেচাল হয়ে গিয়ে যে নাকের ক্ষতি করব এমন সম্ভাবনা নেই। আপনার ভিজিটের জন্য কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে যদি বলেন তা হলে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমার সাধ্যে যতটা কুলোয়...'

'বিশ্বাস করুন,' ডাক্তারের কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় উঠল না, নিচেও নামল না, সম্মোহন শক্তিসম্পন্ন সুমধুর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি ব্যক্তিগত লাভের জন্য কখনও চিকিৎসা করি না। এটা আমার নিয়ম এবং শাস্ত্রকলার বিরোধী। ভিজিটের জন্য ফি আমি অবশ্যই নিই, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে না-নিলে লোকে মনে দুঃখ পাবে। আপনার নাক আমি নিশ্চয় লাগিয়ে দিতে পারতাম; কিন্তু হলফ করে বলছি, আপনি যদি নেহাৎই আমার কথা বিশ্বাস না-করেন, এর ফল অনেক বেশি খারাপ হবে। বরং প্রকৃতির নিজের কার্যকলাপের ওপর এটা ছেড়ে দিন। ঘন ঘন ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোন, আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি নাক থাকলে আপনি যেমন সুস্থ থাকতেন, না-থাকলেও ততটাই থাকবেন। আর নাকটা, আমার পরামর্শ যদি শোনেন, স্পিরিট

www.pathagar.com

দিয়ে একটা বয়ামের ভেতরে রেখে দিন, কিংবা আরও ভালো হয় যদি তার সঙ্গে যোগ করেন বড় চামচের দু চামচ ঝাল ভোদ্‌কা ও ঈষদুষ্ণ ভিনিগার—তা হলে ওটার বদলে আপনি বেশ ভালো দাম পেতে পারেন। এমনকি আমি নিজেই নিতে পারি—যদি আপনার দাম তেমন চড়া না-হয়।'

'না, না! কোনো দামেই বিক্রি করব না!' মেজর কভালিওভ মরিয়া কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'ওটা নষ্ট হয়ে যাক তা-ও সই!'

'মাফ করবেন!' জবাবে ডাক্তার বললেন, 'আমি আপনার উপকারে আসতে চেয়েছিলাম।... তা কী আর করা যাবে! আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না, এটা তো অন্তত আপনি দেখেছেন।'

এই বলে ডাক্তার গুরুগম্ভীর চালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কভালিওভ তাঁর মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাল না, কেবল গভীর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেল ডাক্তারের কালো টেইল-কোটের হাতার ফাঁক থেকে উঁকি মারছে শার্টের তুষারধবল ও পরিচ্ছন্ন হাতার অগ্রভাগ।

পরদিনই সে ঠিক করল অভিযোগ দায়ের করার আগে স্টাফ অফিসারের পত্নীকে একটা চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করবে তার হক জিনিস তিনি তাকে বিনা যুদ্ধে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছেন কি-না। চিঠিটার বয়ান ছিল এই :

'প্রিয় মহাশয়া
আলেক্সান্দ্রা গ্রিগরিয়েভ্‌না,
আপনার অদ্ভুত আচরণের কারণ আমার বোধগম্য নহে। আপনি এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে এবংবিধ আচরণের ফলে আপনার লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই এবং কোনো মতেই আপনি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে আমাকে বাধ্য করিতে পারিবেন না। বিশ্বাস করুন, আমার নাসিকা সংক্রান্ত ঘটনা আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি এবং ইহাও নিশ্চিত জানি যে উক্ত কর্মে মূলত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন আপনি—আপনি ব্যতীত অপর কেহ নহে। উহার আকস্মিক স্থানচ্যুতি, পলায়ন ও ছদ্মবেশ ধারণ—কখনও সরকারি কর্মচারীর বেশ ধারণ, অবশেষে নিজ মূর্তি ধারণ, আপনার, কিংবা আপনার তুল্য যাঁহারা মহৎ কর্মে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মন্ত্রের প্রভাব ব্যতিরেক অন্য কিছু নহে। আমার পক্ষ হইতে আমি এই মর্মে আপনাকে পূর্বাহ্নে অবগত করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি যে আমার উল্লিখিত নাসিকা যদি অদ্যই যথাস্থানে প্রত্যাবর্তিত না-হয় তাহা হইলে আমি আইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইব।
এতদসত্ত্বেও, আপনাকে পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

'ভবদীয় সেবক
প্লাতন কভালিওভ।'

প্রিয় মহাশয়
প্লাতন কুজ্‌মিচ,
আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আশ্চর্য বোধ করিলাম। আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে এবংবিধ অন্যায় ভর্ৎসনা কোনো মতেই প্রত্যাশা করি নাই—আপনার নিকট হইতে তো অবশ্যই নহে। আপনার অবগতির জন্য জ্ঞাপন করিতেছি যে-সরকারি কর্মচারীর উল্লেখ

www.pathagar.com

আপনি করিয়াছেন তাহাকে আমি কদাচ স্বগৃহে অভ্যর্থনা জানাই নাই—ছদ্মবেশে নহে, স্বমূর্তিতেও নহে। সত্য বটে, ফিলিপ ইভানভিচ পতান্‌চিকভ আমার গৃহে আসিতেন। আর যদিচ তিনি যথার্থই আমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছেন এবং যদিচ তিনি সুপাত্র, আচরণে সংযত ও পরম বিদ্বান, তথাপি আমি তাঁকে কদাচ কোনোরূপ আশা-ভরসা প্রদান করি নাই। আপনি নাসিকার প্রসঙ্গও উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বারা আপনি যদি এমত বলিতে চাহেন যে আমি আপনার প্রতি উন্নাসিকতা প্রকাশ করিতেছি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি, তাহা হইলে আমিই এই ভাবিয়া বিস্মিত না-হইয়া পারি না যে আপনি নিজেই এই সম্পর্কে বলিতেছেন, যখন আমি—আপনার অবিদিত নাই—সম্পূর্ণই ইহার বিপরীত মত পোষণ করি; অপিচ এক্ষণে যদি আইনমতে আপনি আমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন তাহা হইলে আমি এই মুহূর্তে আপনার তুষ্টি বিধানে প্রস্তুত, যেহেতু ইহা চিরকালই আমার একান্ত কাম্য ছিল এবং উক্ত ভরসায় আমি সর্বদা আপনার সেবায় প্রস্তুত আছি।

আলেক্সান্দা পদ্‌তোচিনা,

'না', কভালিওভ চিঠি পড়ার পর বলল। 'ঠিকই ভদ্রমহিলার কোনো দোষ নেই। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না! যে-লোক কোনো অপরাধে দোষী তার পক্ষে এমন চিঠি লেখা সম্ভব নয়!' সরকারি কালেক্টরের এটা জানা ছিল, কেননা ককেশাশ অঞ্চলে থাকার সময় কয়েকবার তাকে তদন্তে যেতে হয়। 'কীভাবে, কোন ফেরে পড়ে এমন ঘটনা ঘটল? কী জানি ছাই!' শেষকালে সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসল।

ইতোমধ্যে এই অসাধারণ ঘটনা সম্পর্কে শহরময় গুজব রাষ্ট্র হয়ে গেছে এবং সচরাচর যা হয়ে থাকে—বেশ খানিকটা রঙ ফলিয়ে। সেই সময় অসাধারণত্বের প্রতি সকলের বিশেষ প্রবণতা ছিল : এর মাত্র কিছুদিন আগে জনসাধারণ সম্মোহনশক্তির প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ছিল। পরন্তু কনিউশেন্নায়া স্ট্রিটের নাচিয়ে চেয়ারের ঘটনা তখনও পুরনো হয়ে যায়নি, তাই শিগগিরই লোকে যখন বলতে শুরু করল যে সরকারি কালেক্টর কভালিওভের নাক কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় নেভ্‌স্কি এভিনিউতে নিয়মিত ঘুরে বেড়ায়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। প্রতিদিন অসংখ্য কৌতূহলী লোকজন জড় হতে লাগল। কে একজন যেই বলে উঠেছে যে নাক যুঙ্কারের দোকানে আছে—অমনি যুঙ্কারের দোকানের সামনে এমন ভিড় জমে গেল যে পুলিশের হস্তক্ষেপ দরকার হয়ে পড়ল। থিয়েটারের প্রবেশপথের সামনে নানা ধরনের শুকনো মিঠাইয়ের জনৈক বিক্রেতা—ভদ্র চেহারার জুলফিধারি ফাটকাবাজ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মজবুত গোছের চমৎকার কয়েকটা কাঠের বেঞ্চি বানিয়ে কৌতূহলী লোকজনকে সেগুলোর উপর দাঁড়ানোর আমন্ত্রণ জানাল—একেকজন দর্শকের কাছ থেকে আশি কোপেক করে নিতে লাগল। কোনো-এক মান্যগণ্য কর্নেল বিশেষ করে এরই জন্য বাড়ি থেকে আগে আগে বের হলেন এবং অতি কষ্টে ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু তিনি দারুণ বিরক্ত হয়ে গেলেন যখন দোকানের শো কেস্‌-এ নাকের বদলে দেখতে পেলেন সাধারণ পশমি গেঞ্জি এবং একটা ছাপানো ছবি, যাতে দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে তার পায়ের স্টকিং ঠিক করছে, আর গাছের আড়াল থেকে খোলা ওয়েস্ট কোট পরনে, ছাগল-দাড়িওয়ালা এক ফুলবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছে—আজ দশ বছরেরও বেশি কাল হল ঐ একই জায়গায় ঝুলছে ছবিটা। সরে এসে তিনি আক্ষেপ করে বললেন : 'এ-রকম অর্থহীন, অবিশ্বাস্য গুজব ছড়িয়ে লোকজনকে বিভ্রান্ত করার কোনো মানে হয়?'

www.pathagar.com

তারপর আরও একটি গুজব রটল এই মর্মে যে নেভ্‌স্কি এভিনিউতে নয়, তাভ্‌রিচেস্কি বাগানে ঘুরে বেড়ায় মেজর কভালিওভের নাক—বহুদিন হল নাকি সে ওখানে; খোজরেভ মির্জা যখন ওখানে বাস করতেন তখন নাকি তিনি প্রকৃতির এই অদ্ভুত লীলাখেলা দেখে দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সার্জিকাল একাডেমির কিছু ছাত্র সেখানে রওনা দেয়। সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো এক শ্রদ্ধেয়া মহিলা বিশেষ পত্রযোগে বাগানের ওয়ার্ডেনকে তাঁর ছেলেমেয়েদের এই দুর্লভ দৃশ্য দর্শনের সুযোগ দানের এবং সম্ভব হলে কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও উপদেশাত্মক ভাষ্য দানের অনুরোধ জানান।

শৌখিন সমাজের যেসব লোকজন, বড় বড় সান্ধ্য আসরে নিয়মিত যাতায়াত করত, মহিলাদের হাসাতে ভালোবাসত, তারা এই ঘটনায় পরম পুলকিত হল, কেননা তাদের রসদ ইতোমধ্যে একেবারেই ফুরিয়ে এসেছিল। মুষ্টিমেয় কিছু শ্রদ্ধাভাজন ও সংযত লোক রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলেন। এক ভদ্রলোক বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কী করে বর্তমান এই আলোকপ্রাপ্ত যুগে এমন উদ্ভট কল্পনা ছড়াতে পারে এটা তাঁর পক্ষে বোধগম্য নয়, আর সরকারই-বা কেন এদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না তা ভেবে তিনি বিস্মিত। ভদ্রলোকটি স্পষ্টতই সেই জাতের ভদ্রমণ্ডলীর একজন—যাঁরা সমস্ত ব্যাপারে, এমনকি তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে প্রাত্যহিক ঝগড়াঝাটির ক্ষেত্রেও, সরকারকে জড়িত করতে কুণ্ঠিত হন না। অতঃপর... কিন্তু এখানে সমগ্র ঘটনা আবার ঢাকা পড়ে যায় কুয়াশায়, এবং অতঃপর কী যে ঘটল তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তিন

দুনিয়ার আজেবাজে অনেক কাণ্ডকারখানা ঘটে। কখনও কখনও কোনো কার্যকারণ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না সেসবের। সরকারি পরামর্শদাতার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যে নাক এখানে-ওখানে ভ্রমণ করছিল এবং শহরে এত বড় শোরগোল তুলেছিল, সেই নাকই একদিন হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই আবার ফিরে এল যথাস্থানে, অর্থাৎ মেজর কভালিওভের দুই গালের ঠিক মাঝখানটায়। ঘটনাটি ঘটল এপ্রিল মাসের সাত তারিখে। ঘুম ভাঙার পর দৈবক্রমে আয়নায় দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল—নাক! হাত দিয়ে চেপে ধরল—নাকই বটে! 'হেঁ হেঁ!' কভালিওভ বলল এবং আনন্দে সে খালি পায়ে গোটা ঘর জুড়ে প্রায় এক পাক কসাক ত্রোপাক নাচ নেচেই ফেলেছিল, ইভানের আগমনে ব্যাঘাত ঘটল। মেজর তৎক্ষণাৎ হাতমুখ ধোয়ার সরঞ্জাম দিতে বলল, হাতমুখ ধোয়ার পর সে আরও একবার আয়নার দিকে তাকাল : নাক! তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে সে আবার তাকাল আয়নার দিকে : যথার্থ নাক!

'ইভান দেখ দেখি, আমার নাকের ওপর যেন একটা ফুসকুড়ি উঠেছে', কথাটা বলেই সে মনে মনে ভাবতে লাগল : 'সর্বনাশ, ইভান যদি বলে বসে : না কর্তা, ফুসকুড়ি কোথায়, নাকই তো নেই দেখছি!'

কিন্তু ইভান বলল :

'কিছু নেই, কোনো ফুসকুড়ি-টুসকুড়ি নেই—নাক পরিষ্কার!'

'ভালো কথা, জাহান্নামে যাক!' মনে মনে এই কথা বলে মেজর তুড়ি মারল। এই সময় দরজায় উঁকি মারল নাপিত ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ, কিন্তু এমন ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে, যেন একটা বেড়াল মাংসের খণ্ড চুরি করার অপরাধে এই মাত্র উত্তমমধ্যম খেয়েছে।

'আগে বল্‌ দেখি হাত পরিষ্কার আছে তো?' দূর থেকেই কভালিওভ ওর উদ্দেশে গর্জন করে উঠল।

www.pathagar.com

'আছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'ঈশ্বরের দিব্যি, পরিষ্কার আছে কর্তা।'

'থাকলেই ভালো, দেখিস কিন্তু!'

কভালিওভ বসল। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ একটা তোয়ালে দিয়ে তাকে জড়াল, চোখের পলকে ব্রাশের সাহায্যে তার পুরো দাড়ি এবং গালের একটা অংশ এমন ফেটানো ক্রিমের পুঞ্জে পরিণত করে ফেলল, যা পরিবেশিত হয়ে থাকে ব্যবসায়ীদের বাড়ির জন্মদিনের পার্টিতে।

'বোঝ কাণ্ড!' নাকটার দিকে তাকিয়ে ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ মনে মনে বলল, তারপর মাথা অন্য দিকে কাত করে সেটাকে দেখল একপাশ থেকে। 'দেখ দেখি! ভাবাই যায় না!' মনে মনে বলতে বলতে সে অনেকক্ষণ ধরে নাকটাকে দেখতে লাগল। অবশেষে নাকের ডগা ধরার উদ্দেশ্যে সে এত সন্তর্পণে ও আলতো করে দুটো আঙুল সামান্য ওঠাল যে তা কল্পনাই করা যায় না। এটাই ছিল ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের অভ্যস্ত রীতি।

'দেখিস, দেখিস, সাবধান!' কভালিওভ চেঁচিয়ে বলল।

এই কথায় ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ থতমত খেয়ে, স্তম্ভিত হয়ে হাত নামিয়ে ফেলল, জীবনে আর কখনও এমন স্তম্ভিত সে হয়নি। শেষ পর্যন্ত সে সন্তর্পণে ক্ষুর দিয়ে মেজরের চিবুকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল; ঘ্রাণেন্দ্রিয় না-ধরে দাড়ি কামাতে যদিও তার পক্ষে রীতিমতো অসুবিধাজনক ও কঠিন ঠেকছিল তথাপি সে কোনো রকমে তার খসখসে বুড়ো আঙুল মেজরের গালে ও নিচের মাড়িতে ঠেকিয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত দাড়ি কামানো সারল।

সব হয়ে গেলে তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরে নিল কভালিওভ, একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে সোজা চলল মিঠাইয়ের দোকানে। প্রবেশ করতে করতে দূর থেকেই সে হাঁক দিয়ে বলল, 'বয়, এক কাপ চকলেট!' আর নিজে সেই মুহূর্তে এগিয়ে গেল আয়নার দিকে : হ্যাঁ, নাক আছে! সে খুশি হয়ে পেছন ফিরল, চোখ সামান্য কুঁচকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকাল দু'জন সামরিক অফিসারের দিকে, যাদের একজনের নাক ওয়েস্ট কোটের বোতামের চেয়ে কোনো অংশে বড় ছিল না। এরপর সে রওনা দিল কোনো এক ডিপার্টমেন্টের অফিসের দিকে যেখানে সে চেষ্টা-চরিত্র করছিল ছোটোলাটের পদ লাভের—আর নেহাৎই না-জুটলে যাতে কোনো প্রশাসনিক পদ পাওয়া যায়, তার জন্য। রিসেপশন-রুমের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে আয়নায় দিকে দৃষ্টিপাত করল; নাক যথাস্থানে আছে! অতপর সে গেল আরেকজন কালেক্টর বা মেজরের কাছে—খুব রসিক লোক, তার নানা ধরনের খোঁচামারা মন্তব্যের জবাবে কভালিওভ প্রায় বলত : 'হুঁ, তোমাকে আর চিনি নে? হুল ফোটাতে ওস্তাদ!' পথে সে ভাবল : 'মেজরও যদি আমাকে দেখে হাসিতে ফেটে না-পড়ে তা হলে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে, যা যা থাকার ঠিক আছে, যথাস্থানে আছে।' কিন্তু কালেক্টরটির প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। 'ভালো, ভালো, মরুক গে ছাই!' কভালিওভ মনে মনে ভাবল। পথে স্টাফ অফিসার পদ্‌তোচিনের স্ত্রী আর কন্যার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল, তাদের উদ্দেশে নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল কভালিওভ, তার দেখা পেয়ে ওরা উল্লসিত হয়ে চেঁচাল : তার মানে, কিছুই ঘটেনি, কোনো ক্ষয়ক্ষতি তার হয়নি। সে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল এবং ইচ্ছে করেই নস্যিদানি বার করে তাদের সামনে বেশ সময় নিয়ে নাকের দুটো প্রবেশপথেই নস্যি ঠাসতে ঠাসতে মনে মনে বলল : 'তোমাদের, এই মেয়ে জাতটার এমনই হওয়া উচিত! মুর্গির জাত কোথাকার! যাই

www.pathagar.com

বল-না কেন, তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। হ্যাঁ, নেহাৎ যদি Par amour হত তাহলে না-হয় কথা ছিল!' এর পর থেকে মেজর কভালিওভ নেভ্স্কি এভিনিউতে, থিয়েটারে সর্বত্র পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর নাকও পরম নিশ্চিন্তে বসে রইল তার মুখের উপর, এমনকি কোনোকালে যে স্থানচ্যুত হয়েছিল তেমন লক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল না। আর এর পর কভালিওভকে সর্বক্ষণ দেখা যেত খোশমেজাজে, তার মুখে হাসি লেগে থাকত। সোৎসাহে সমস্ত সুন্দরী মহিলার পিছু নিত সে, এমনকি একবার সে শহরের বাজারপাড়ায় এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে পদক ঝোলানোর একটা ফিতেও কিনে ফেলে সে, যদিও কারণটা ছিল অজ্ঞাত, কেননা সে নিজে কোনো পদকের অধিকারী ছিল না।

এমনই ঘটনা ঘটেছিল আমাদের এই সুবিশাল দেশের উত্তরের মহানগরীতে! সমস্ত ব্যাপার মনে মনে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে এর মধ্যে অবিশ্বাস্য অনেক কিছু আছে। দস্তুরমতো অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত উপায়ে নাকের স্থানচ্যুতি এবং সরকারি পরামর্শদাতার বেশে বিভিন্ন স্থানে নাকের আবির্ভাবের কথা যদি ছেড়েও দিই, এ জিনিসটা কভালিওভ কেন বুঝতে পারল না যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে নাক সম্পর্কে ঘোষণা করা সঙ্গত নয়? আমি এখানে এই অর্থে বলছি না যে বিজ্ঞাপনের পেছনে অর্থব্যয় আমার কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে : এ নেহাৎই বাজে কথা, আমি আদৌ অর্থগৃধ্নু শ্রেণীর লোক নই। কিন্তু ব্যাপারটা অশোভন, অসঙ্গত, ভালো নয়! তা ছাড়া আরও একটা কথা—নাক কী করে সদ্য-সেঁকা রুটির ভেতরে এল, আর খোদ ইভান ইয়াকভ্লেভিচের-বা কী হল?...না, এটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, একেবারেই না! কিন্তু আরও অদ্ভুত, সবচেয়ে দুর্বোধ্য ব্যাপার হল এই যে লেখকরা কী বলে এমন বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন! স্বীকার করতে বাধা নেই, এটা সম্পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, এটা আসলে...না, না, আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারছি না। প্রথমত, এতে স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার নেই; আর দ্বিতীয়ত... হ্যাঁ, দ্বিতীয়তও কোনো উপকার দেখি না। সোজা কথা, আমি জানি না এটা কী।...

যে যাই হোক-না কেন, এ-সব সত্ত্বেও, যদি এটা-ওটা এবং আরও কিছু কিছু অবশ্যই ছেড়ে দেওয়া যায়। এমনকি হয়তো-বা... আর সত্যিই তো, সামঞ্জস্যহীন কাণ্ডকারখানা কোথায়ই-বা না ঘটে?... কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও, একটু ভেবেচিন্তে দেখলে, এই সমস্তটার মধ্যে কিছু-একটা আছে, অবশ্যই আছে। যে যাই বলুন-না কেন, এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে ক্বচিৎ, তবে ঘটে।

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com